হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হয়েছিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শ্রেষ্ঠ মুমিন কে? তিনি বলেছেন, "যার চরিত্র সবচেয়ে উন্নত।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা লোকদেরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করো না বরং তোমাদের সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র দ্বারা বশীভূত কর।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "সির্কা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, নিকৃষ্ট চরিত্রও তেমনি আমলকে বরবাদ করে দেয়।"

হযরত জরীর ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর আকৃতি দান করেছেন, অতএব তুমি তোমার চরিত্রকেও সুন্দর কর।"

হযরত বারা' ইব্‌নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

"হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার আকৃতিকে যেমন সুন্দর করেছেন, আমার চরিত্রকেও তেমনি সুন্দর করে দিন।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে স্বাস্থ্য, শান্তি এবং উন্নত চরিত্র প্রার্থনা করি।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ وَحَسَبُهُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَمُرُوْءَتُهُ عَقْلُهُ

"মুমিনের মর্যাদা হচ্ছে তার দ্বীন, আভিজাত্য হচ্ছে তার উন্নত চরিত্র, আর মনুষত্ব হচ্ছে তার বুদ্ধি–বিবেক।"

হযরত উসামাহ্ ইব্‌নে শারীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি লক্ষ্য করেছি যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন মরুচারী বেদুঈন লোক জিজ্ঞাসা করছে ঃ শ্রেষ্ঠতম নেক গুণ যা বান্দাকে দেওয়া হয়েছে তা কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ "সুন্দর চরিত্র।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا

"কিয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতর আসনের অধিকারী হবে ঐসব লোক যাদের চরিত্র সুন্দর।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مَنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ اَوْ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ فَلَا تَعْتَدُّوْا بِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِهٖ تَقْوًى تَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللّٰهِ وَحِلْمٌ يَكُفُّ بِهِ السَّفِيْهَ اَوْ خُلُقٌ يَعِيْشُ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ.

"তিনটি গুণ যার মধ্যে নাই অথবা (অন্ততঃ পক্ষে) একটি গুণও নাই তার আমলের কোনই মূল্য নাই ঃ এক. আল্লাহ্‌ভীতি, যা তাকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হতে বিরত রাখবে। দুই. ধৈর্য ও পরিণামদর্শিতা, যা তাকে জাহালত ও মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে বিরত রাখবে। তিন. সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র, যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে বসবাস করবে।"

বর্ণিত আছে, নামায আরম্ভ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ.

"আয় আল্লাহ্! আমাকে সুন্দর চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন, সেদিকে আপনি ছাড়া আর কেউ পথ-প্রদর্শন করতে পারে না। আয় আল্লাহ্! নিকৃষ্ট চরিত্র আমা থেকে দূরীভূত করে দিন, আপনি ছাড়া আর কেউ তা দূরীভূত করতে পারে না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ কিসে সৌন্দর্য লাভ হয়? তিনি বলেছেন, নম্র কথনে, মুক্তমন ও সহাস্য আচরণে। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সুন্দর আখলাক ও উন্নত চরিত্রের আচরণ করবে, পরিচিত-অপরিচিত সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে ; তাকে ভালবাসবে ও প্রশংসা করবে।

জনৈক জ্ঞান-বৃদ্ধের উপদেশ হচ্ছে ঃ "সৎগুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের যাবতীয় দিক যদি তোমার ভিতর-বাইরে সন্নিবেশিত করতে পার ; সর্বশ্রেণীর লোকের সাথে তোমার আচার-আচরণ যদি সুন্দর হয়, তাহলে আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে প্রভুত কল্যাণ দান করবেন, সেই সঙ্গে দুনিয়ার মানুষও তোমার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবে।

অধ্যা

হাস্য, ক্র

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

"তবে কি তোমরা এই কথায় বি
না, আর তোমরা অহংকার কর

অর্থাৎ তোমরা এই কুরআনের
অবিশ্বাস করছো, অথচ এ পবিত্র
প্রেরিত। তোমরা কুরআন পাকের
সত্য ও বাস্তব সতর্কবাণী রয়েছে
না ; তোমাদের প্রতি কুরআনের
গাফেল, অন্যমনস্ক।

বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াত
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও
হাসতেন।

এক রেওয়ায়াতে এমনও বর্ণিত
পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
মুচকি হাসতেও দেখা যায় নাই ;
মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) ব
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থে
বলছে আর মুখভরে হাসছে। এ ত

প্রতিবেশীকে জ্বালাতন করে। হুযূর বললেন ঃ "সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।"

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ জ্ঞাপন করলে তিনি বললেন ঃ ছবর কর। অতঃপর আরও দু'বার এমনি হলো। চতুর্থবার হুযূর বললেন ঃ তুমি তোমার বিছানাপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ। লোকটি তাই করলো। এবার যেকোন পথচারী লোকটির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে-লোকটির এই দশা কেন? কারণ জানতে পেরে লোকেরা বলতে লাগলো-জালেম প্রতিবেশীর উপর আল্লাহ্র লা'নত। এ কথা প্রতিবেশীর গোচরীভূত হওয়ার পর সে এসে লোকটিকে অনুরোধ স্বরে বলতে লাগলো—ভাই, তুমি তোমার বিছানা-পত্র স্বস্থানে নিয়ে নাও ; আমি আর কোনদিন তোমার সাথে অসদাচরণ করবো না।

ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ "মসজিদের দরজায় এ কথা লিখে দাও ঃ "ওহে লোকসকল! আশ-পাশের চল্লিশ বাড়ীর লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশী।" ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বলেন ঃ চতুর্দিকের প্রত্যেক দিকে চল্লিশটি করে বাড়ী বুঝানো হয়েছে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোক, বাড়ী এবং ঘোড়া এই তিনের মাঝে শুভ এবং অশুভ দু'টিই রয়েছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে শুভ হচ্ছে, তার মহর কম হওয়া, সহজে বিবাহ হয়ে যাওয়া এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের হওয়া। এর অশুভ দিক হচ্ছে, মহর বেশী হওয়া, সহজে বিবাহ না হওয়া এবং দুশ্চরিত্রা হওয়া।

বাড়ীর ব্যাপারে শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, বাড়ী প্রশস্ত হওয়া, প্রতিবেশী সৎ হওয়া। আর অশুভ দিক হচ্ছে, বাড়ী সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী অসৎ হওয়া।

ঘোড়ার শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, মালিকের বশীভূত হয়ে থাকা এবং ঘোড়ার মধ্যে কোনরূপ কুঅভ্যাস না থাকা। আর অশুভ ও মন্দ দিক হচ্ছে, মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হওয়া এবং কুঅভ্যাস থাকা।

এ কথাও অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাড়া-প্রতিবেশীর

দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, সে কাউকে কষ্ট দিবে না ; বরং অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা সহ্য করাও প্রতিবেশীর দায়িত্ব। কেননা, প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার সাথে সদ্ব্যবহার তখনই প্রতিফলিত হবে যখন তার কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টে ছবর করা হবে ; কেবল কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম প্রতিবেশীর হক-আদায় নয়। অধিকন্তু প্রতিবেশীর সাথে বিনয় ও বিনম্র স্বভাব অবলম্বন করবে, তার প্রতি অনুকম্পা-অনুগ্রহ করবে— এটা জরুরী। বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন দরিদ্র প্রতিবেশী ধনী প্রতিবেশীর আচল ধরে ফেলবে এবং অভিযোগ করবে— আয় রব্ব! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন তার ধন-সম্পদ থেকে আমাকে দান করা হতে বিরত রয়েছে, কেন সে আমা থেকে তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

একদা হযরত ইব্নে মুকাফ্ফা জানতে পেলেন যে, ঋণ পরিশোধের জন্য তার প্রতিবেশী বাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছে। তিনি তাকে তা বিক্রি করতে বারণ করলেন এবং পরিমিত টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য হাদিয়া করে দিলেন।

এক বুযুর্গ তাঁর বাড়ীতে ইঁদুরের উৎপাতের কথা উল্লেখ করলে এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললো ঃ আপনি বিড়াল পোষলে সমস্যা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ এতে খুবই আশংকা রয়েছে যে, বিড়ালের ডাক শুনে ইঁদুর ভয়ে আমার বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নিবে। আমি নিজের জন্য এরূপ হওয়াটা পছন্দ করি না, তাই আমার প্রতিবেশীর জন্যে এটা কেন পছন্দ করবো? সুতরাং এ হতে পারে না।"

মোটকথা, পাড়া-প্রতিবেশীর যেসব হক ও অধিকার রয়েছে, তা মোটামুটিভাবে (সংক্ষেপে) এই যে, সাক্ষাতে তুমি আগে তাকে সালাম দিবে, অযথা আলাপ দীর্ঘ করবে না, বেশী বেশী প্রশ্নের অবতারণা করবে না, অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, মুসীবতে তাকে সান্ত্বনা দিবে, শোক-দুঃখে তাকে সঙ্গ দিবে, তার আনন্দে তুমিও আনন্দ প্রকাশ করবে ; তাকে অভিনন্দিত করবে, তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবে, তার বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে তাকাবে না ; তার গোপনীয়তা নষ্ট করবে না, তার বাড়ীর দেওয়ালে কোন পশু-ছানা বা অন্য কোন বস্তু রেখে তাকে বিরক্ত করবে না, তার সীমানাস্থিত ড্রেন বা প্রণালীতে পানি প্রবাহিত করবে না, তার আঙ্গিনায়

ধুলি-বালি বা মাটি নিক্ষেপ করবে না, তার গৃহে প্রবেশের রাস্তা সংকীর্ণ করবে না, ঘরে কিছু নিয়ে যেতে থাকলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে না, তার কোন গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গোপন করে রাখবে ; প্রচার করবে না, আপদ-বিপদে তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীর প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টি রাখবে, তার বিরুদ্ধে কোন কথায় কর্ণপাত করবে না, তার ইয্যত-সম্ভ্রম রক্ষায় তৎপর থাকবে, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখবে, পরিচারিকার প্রতি তাকাবে না, তার শিশু-সন্তানদের সাথে সবিনয় মিষ্ট-মধুর আচরণ করবে, দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ হলে মহব্বতের সাথে তাকে সৎ-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে, এমনিভাবে পার্থিব বিষয়েও তাকে সুপরামর্শ প্রদান করবে। এ হচ্ছে সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশীর মোটামুটি হকসমূহ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা কি জান প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি? সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, তার সহযোগিতায় শরীক হবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে, সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, তার মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে ; জানাযার পিছনে অনুসরণ করবে, তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে, তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, তার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উঁচু করবে না ; যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায়, তাকে যন্ত্রণা দিবে না, যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাকে কিছু দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার সন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দিবে না ; যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায়, হাঁড়িতে কিছু রান্না করার সময় ধোঁয়ায় তাকে কষ্ট দিও না ; অন্যথায় কিছু খাদ্যাংশ তার ঘরে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَتَدْرُوْنَ مَا حَقُّ الْجَارِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَهُ اللّٰهُ ـ

"প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি তা কি তোমরা জান? যাঁর

হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ্র অনুগৃহিত ব্যক্তি ছাড়া প্রতিবেশীর পুরাপুরি হক কেউ আদায় করতে পারবে না।"

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এক গোলাম বকরীর গোশত তৈরী করছিল। তিনি তাকে বললেন, গোশত তৈরী শেষ হলে আমাদের ইহূদী প্রতিবেশী থেকে তা বন্টন করা শুরু করবে। এ কথা তিনি পর পর কয়েকবার বললেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, একই কথা আপনি আর কতবার বলবেন? তিনি বললেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তখন ভেবেছি শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।

হযরত হিশাম (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত হাসান (রাযিঃ) ইহূদী কিংবা নাসারা প্রতিবেশীকে কুরবাণীর গোশতের কিছু অংশ দেওয়াটাকে দোষণীয় কিছু মনে করতেন না।

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন ঃ আমার পরম প্রিয় বন্ধু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন ঃ

اِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَاَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ جِيْرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

"যখন তরকারী রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং প্রতিবেশীগণকে তা থেকে কিছু দাও।"

অধ্যায় ঃ ৯১

মদ্যপান ও তার শাস্তি

মদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে তিনখানি আয়াত নাযিল করেছেন। সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতখানি ঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের কোন কোন উপকারও আছে।" (বাকারাহ্ ঃ ২১৯)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন মুসলমান মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ ত্যাগ করেন নাই। পরবর্তীতে এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নামায আরম্ভ করেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুরআনের সূরা ভুল পড়তে লাগলেন। তখনই দ্বিতীয় এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না।" (নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও কোন কোন মুসলমান মদ্যপান অব্যাহত রাখেন। আবার কেউ কেউ তা পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে পুনরায় এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উটের গণ্ডদেশের একটি হাঁড় উঠিয়ে হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌নে আউফের মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্য করে ক্রন্দন করে শোক

ও প্রশংসা কীর্তন করতঃ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে চাদর হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং হাতে যা ছিল তা তিনি লোকটির প্রতি ছুড়ে মারলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলতে আরম্ভ করলো ঃ আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখনই মদ সম্পর্কে কুরআনের এ তৃতীয় আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো— মদ, জুয়া, মূর্তি এবং হুয়ার জন্যে তীর নিক্ষেপ এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?" (মায়েদাহ্ ঃ ৯১)

আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রাযিঃ) শেষাংশের জের ধরে স্বীয় আনুগত্য ও সমর্থন নিবেদন করে বললেন ঃ

اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا

"বিরত হলাম, বিরত হলাম।"

মদ্যপানের নিষিদ্ধতা-সম্পর্কিত প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

"মদ্যপানে অভ্যাসরত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَوَّلُ مَا نَهَانِي رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَمُلَاحَاتِ الرِّجَالِ.

"মূর্তিপূজার সর্বপ্রথম যে গর্হিত কাজের নিষেধাজ্ঞা আমার কাছে এসেছে তা হলো, মদ্যপান ও ঝগড়া-ফাসাদ।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যেসব লোক দুনিয়াতে মদ্যপানে একত্রিত হয়েছে, জাহান্নামে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একত্র করবেন। সেখানে তারা পরস্পর একে অপরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে বলতে থাকবে— হে অমুক! আমার সাথে (দুনিয়াতে) তুমি যে আচরণ করেছ সেজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ভাল বদলা না দিন ; জাহান্নামের এই আযাব তুমিই আমাকে পৌঁছিয়েছ। এভাবে অন্যান্যরাও বলতে থাকবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মদ পান করেছে, আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন মারাত্মক বিষ পান করাবেন, যা তার সম্মুখে আনার সাথে সাথে তার চেহারার গোশত ও চামড়া বিষপাত্রের মধ্যে খসে পড়ে যাবে। আর যখন তা তাকে পান করানো হবে তখন সর্ব শরীরের গোশত-চামড়া খসে পড়বে ; অন্যান্য দোযখীরাও এ বিষক্রিয়ায় কষ্ট বোধ করবে। ওহে লোক সকল! শুনে রাখ— যে মদ পান করে, যে এর রস বের করে, যে রস নিয়ে যায়, যে বহন করে, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে মদের মূল্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরা সকলেই এই পাপের অংশীদার ; আল্লাহ্ তা'আলা এদের নামায, রোযা, হজ্জ কবূল করবেন না যাবৎ এরা তওবা না করবে। তওবার পূর্বেই যদি এরা মারা যায়, তবে দুনিয়াতে যা পান করেছে তার প্রতি ঢোকে তাদেরকে জাহান্নামের পূঁজ পান করানো আল্লাহ্ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায়। খবরদার! খবরদার! সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম ; সর্বপ্রকার মদ হারাম।"

ইব্নু আবিদ্দুনিয়া (রহঃ) বলেন ঃ "আমি এক মদ্যপ নেশাগ্রস্তের পার্শ্ব

দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম ; দেখি—সে নিজের হাতের উপর প্রস্রাব করছে আর এ দ্বারা তার হাত ধৌত করছে যেমন উযূকারী ব্যক্তি করে থাকে। আবার সে মুখে উচ্চারণ করছে—আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি দ্বীন-ইসলামকে নূরস্বরূপ এবং পানিকে পবিত্রতার উপাদানস্বরূপ দিয়েছেন।"

আব্বাস ইব্নে মিরদাসকে জাহেলিয়াত-যুগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ আপনি মদ পান করেন না কেন ; অথচ এটা শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে? তিনি বলেছেন ঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, একটা ঘৃণ্য মূর্খতার বস্তু আমি আমার নিজ হাতে ধরবো, আবার নিজ হাতেই সেটা নিজের পেটে ভরবো ; আমি পছন্দ করি না যে, সকালে আমি সাধারণ মানুষের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবো আবার সন্ধ্যাবেলায়ই তাদের সামনে নেশাগ্রস্ত নির্বোধ-নাদান প্রতীয়মান হবো।"

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সমস্ত কুকার্যের উৎসমূল (মদ্যপান) থেকে তোমরা বেঁচে থাক। পূর্বেকার যুগের জনৈক ইবাদত-গুযার ও সাধু লোক ছিল। জন-কোলাহল থেকে দূরে বিজন এক স্থানে সে ইবাদতে মগ্ন থাকতো। একদা জনৈকা স্ত্রীলোকের তার সাথে সখ্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুবাদে কোন এক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের অজুহাতে আপন কৃতদাসের মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি তাকে খবর দিলে সে এসে উপস্থিত হয়। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্ত্রীলোকটি প্রতিটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার সাথেই ছিল একটি বালক। স্ত্রীলোকটি বললো ঃ আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকি নাই ; এটা কেবল বাহানা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি এই বালকটিকে খুন কর অথবা আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও কিংবা এক পেয়ালা মদ পান কর। অন্যথায় আমি চিৎকার দিয়ে লোকজন জড়ো করে তোমাকে অপমান করে ছাড়বো। লোকটি কোন দিশা না পেয়ে মদ্যপানে রাজী হলো। এক পেয়ালা মদ পান করে সে বলতে লাগলো ঃ আরও দাও। এভাবে সে বারবার পান করলো। অবশেষে সে স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো, এমনকি বালকটিকেও সে খুন করলো। ওহে লোক সকল! মদ্যপান পরিহার কর, তা থেকে পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে চল। আল্লাহ্র কসম, একই ব্যক্তির হৃদয়ে মদ্যপান ও ঈমান কস্মিনকালেও একত্র

হয় না ; একটি থাকে তো অপরটি বের হয়ে যায়।”

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমার এক কন্যা অসুস্থা হয়ে পড়ে। তার জন্য আমি নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) তৈরী করেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তিনি দেখলেন—খেজুরের নবীযে পাগ উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি আরজ করলাম—আমার পীড়িতা কন্যার চিকিৎসা করা। তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ اُمَّتِىْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا ـ

“কোনরূপ হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য রোগ-নিরাময় রাখেন নাই।”

বর্ণিত আছে, “যখন মদ হারাম করা হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এর সর্ববিধ উপকারিতা উঠিয়ে নিয়েছেন।”

অধ্যায় ঃ ৯২

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত কাতাদাহ্ থেকে, তিনি হযরত আনাস ইব্নে মালেক থেকে এবং তিনি হযরত মালেক ইব্নে সা'সাআহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট মি'রাজ-রজনীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আমি কাবা ঘরের হাতীমে[১] ছিলাম, অধিকাংশ সময় বলেছেন, পাথরের উপর শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার নিকট একজন আগন্তুক (জিব্রাঈল) আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি শুনেছি, হুযূর বলেছেন ঃ (অঙ্গুলি নির্দেশনা করে) আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে। এক বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জারূদকে জিজ্ঞাসা করলাম যিনি শ্রোতা হিসাবে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি দেহের কোন কোন স্থানকে উদ্দেশ্য করেছেন? তিনি বললেন ঃ গলদেশ হতে পশম পর্যন্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তিনি (জিব্রাঈল) আমার দিল্ বের করে ঈমানী নূর দ্বারা ভরপুর এক সোনার খাঞ্চায় রেখে আমার অন্ত্রনালী ইত্যাদি ধৌত করে পুনরায় তা যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর আমার নিকট গাধার চেয়ে বড় অথচ খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট সুদৃশ্য একটি জন্তু হাজির করা হলো। জারূদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হামযাহ্ (হযরত আনাসের উপনাম)! এটিই কি ছিল বুরাক? হযরত আনাস (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ, এটিই বুরাক—শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যতদূর যায়, এক এক পদক্ষেপে নিমিষের মধ্যে সে ততদূর পথ অতিক্রম করছিল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন,

[১] হাতীম— কা'বা ঘরেরই একাংশ, কাবা পুনঃনির্মাণের সময় তা বাইরে পড়ে গিয়েছিল এবং অদ্যাবধি সে অবস্থায়ই রয়েছে।

আমাকে সেই বুরাকের উপর আরোহন করানো হলো এবং হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে আমরা দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আসমান) পৌছে গেলাম। দরজা খোলার জন্য বলা হলে ভিতর থেকে আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর—আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন হলো, "সঙ্গে আর কে?" উত্তর—"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" পুনরায় প্রশ্ন হলো, "তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিব্‌রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন, "হাঁ"। শুনামাত্রই "মারহাবা" (খুশী হউন) ও শুভাগমন বলতে বলতে ফেরেশ্‌তা দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে (প্রথম আসমানে) ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, এই যে আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি–সালাম করে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"যোগ্য ছেলে, যোগ্য নবী—খুশী থাক।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর— "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিবরাঈল (আঃ) উত্তর করলেন—"হাঁ"। শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তাঁরাও অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইয়াহ্‌য়া ও ঈসা আলাইহিমাস্‌ সালাম ; তাঁরা নবী আলাইহিস্‌ সালামের খালাতো ভাই। জিব্‌রাঈল বললেন ঃ তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তারা জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"খুশী হউন হে আমাদের যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর আমাকে নিয়ে জিব্‌রাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে উপনীত

হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—"কে?" জিব্‌রাঈল বললেন,"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন—"মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তারাও দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর দিলেন—"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো—"সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন— "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্‌ সালাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হযরত ইদরীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো, "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত হারূন আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত হারূন, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উপনীত হলেন। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিবরাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "সালাম করুন, ইনি হযরত মূসা (আঃ)।" আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর আমি যখন ঊর্ধ্ব-পথে রওয়ানা হলাম, তখন হযরত মূসা (আঃ) ক্রন্দন করে উঠলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "এই নব্য যুবক পয়গাম্বর? আমার পরে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত বেহেশ্‌তে যাবে অনেক বেশী সংখ্যায়।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পৌছলেন সপ্তম আসমানে। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে অভ্যর্থনা জানান। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"যোগ্য ছেলে যোগ্য নবী খুশী থাক।"

অতঃপর আমাকে আরও ঊর্ধ্বলোকে "সিদ্‌রাতুল-মুনতাহা"য় পৌছানো হয়েছে। সেই বৃক্ষের একটি কুল 'হাজরে'র (এক স্থানের নাম) বিখ্যাত মটকার মত বড়। আর এক একটি পাতা যেন হাতীর এক একটি কান। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি সিদ্‌রাতুল-মুন্‌তাহা।" সেখানে দেখি চারটি নদী প্রবাহিত। জিজ্ঞাসার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, যে দুইটি নদী ভিতরের দিকে প্রবাহিত, সেই দুইটি বেহেশতের নদী। আর বহির্মুখী নদী দুইটি নীল ও ফুরাত (অর্থাৎ নীল নদ ও ফুরাত নদীর প্রতিকৃতি)।"

অতঃপর আমাকে বায়তুল-মা'মূরে প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং একবার বের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাদের পালা আসে না।

অতঃপর আমার সম্মুখে এক পেয়ালা শরাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু রেখে যেটি ইচ্ছা পান করতে আমাকে বলা হলো। আমি দুধের পেয়ালাটি শুধু গ্রহণ করি। এতদ্দর্শনে জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি দ্বীন (ধর্ম), যার উপরে আপনি এবং আপনার উম্মত কায়েম থাকবেন।"

অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। সেখান হতে ফেরার পথে মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট এলে তিনি জানতে চাইলেন— কি কি ফরয করা হয়েছে। আমি বললাম, "দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।" হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মতের দ্বারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনও সম্ভবপর হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কতই অসুবিধা ভোগ করেছি। তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা ও

তদবীরে আমি কম করি নাই। কিন্তু সবই বৃথা গিয়েছে। কাজেই আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে নামাযে আরও কিছু কম করিয়ে নিন। অতঃপর আমি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে অনুরোধ জানালে পর আল্লাহ্ তা'আলা দশ ওয়াক্ত মাফ করলেন। ফেরার পথে আবার মূসা (আঃ)–এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শঙ্কা প্রকাশ করে আরও কিছুটা লাঘব করে নেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি আবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয় আরযী পেশ করলাম। এবার আরও দশ ওয়াক্ত নামায মওকূফ করা হলো। এবারও মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দেন। আর আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করলে আরও দশ ওয়াক্ত নামায লাঘব করে দেন। ফেরার পথে মূসা (আঃ)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি পূর্ববৎ আরও কিছুটা লাঘব করে নিতে বলেন। আমি পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করি। তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেওয়া হলো। পুনরায় যখন মূসা (আঃ)–এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি (শুনে) পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলাম। এবার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ফিরে আসলে এবারও তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারবে না। আমি বনী ইসরাঈল–এর দরুন বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি–তাদেরকে নিয়ে আমি কতই না অসুবিধা ভোগ করেছি। কাজেই অবস্থা আমার খুব জানা আছে। সুতরাং আপনি আরও কমিয়ে নিতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বারবার গিয়ে আব্দার করেছি। এখন আমার লজ্জাবোধ হয়। আমি আর যেতে চাই না। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই আমি কবূল করে নিলাম।" এমন সময় আরশ হতেও আওয়ায আসলো ঃ

اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ -

"আমার ফরয বলবৎই রেখেছি, তবে বান্দাদের কাজ লাঘব করে দিয়েছি।"

অধ্যায় ঃ ৯৩

জুমু'আর ফযীলত

জুমু'আর দিন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতময় দিন। এই দিনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন–ইসলামকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, অনুরূপ মুসলমানদের জন্য এ দিনটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط

"যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়–বিক্রয় ত্যাগ কর।" (জুমু'আহ্ ঃ ৯)

অতএব, জুমু'আর আযানের পর দুনিয়াবী কাজে মগ্ন না থেকে খুতবা ও নামাযের জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অনুরূপভাবে জুমু'আর জন্য বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এমন কার্যসমূহ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আমার এই দিনে এবং আমার এই স্থানে জুমু'আ ফরয করেছেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "বিনা উযরে যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে (দুর্ভাগ্যের) সিলমোহর লাগিয়ে দিবেন।" অন্য সূত্রে বর্ণিত— এমন ব্যক্তি ইসলামকে যেন স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো।

এক ব্যক্তি হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)–এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, জনৈক ব্যক্তি মারা গেছে ; সে জুমু'আ পড়তো না এবং জামাতেও হাজির হতো না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি দোযখে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি এক

মাস পর্যন্ত একই প্রশ্ন করতে থাকলো এবং ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) তাকে একই জবাব দিলেন যে, সে দোযখে যাবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—ইহূদী নাসারাদেরকে জুমু'আর এই দিনটি দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা এতে মতবিরোধ করেছে। ফলে, এ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আর আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর দিনের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, আমরা তা লাভ করেছি এবং পূর্ব থেকেই এ দিনটি এই উম্মতের জন্য রাখা হয়েছিল। এ উম্মতের জন্য দিনটি ঈদের দিন। সুতরাং এই উম্মত সকলের অগ্রবর্তী হয়ে গেল আর ইহূদী-নাসারাগণ পিছনে পড়ে গেল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট তশরীফ আনলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি শুভ্র কাঁচের টুকরা; বললেন, এটি জুমু'আ—আপনার রব্ব আপনার উপর ফরয করেছেন, যাতে আপনার জন্য এবং আপনার পর উম্মতের জন্য এটি দলীল স্বরূপ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতে আমাদের জন্য কি আছে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এতে এমন একটি মহামূল্যবান মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন নেক মকসূদ পূরণের জন্য সেই মুহূর্তে দো'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবূল হবে। আর যদি সেই প্রার্থিত বস্তু তার ভাগ্যে পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ না থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে তদপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু দান করবেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ সেই মুহূর্তে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ কোন অনিষ্টকর বস্তু থেকে পানাহ চায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তদপেক্ষা বড় বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আমাদের নিকট এ দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার। আখেরাতে এ দিনটিকে আমরা 'ইয়াওমুল-মাযীদ' (অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস) বলে ডাকবো। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্রাঈল বললেন, 'বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি স্থান তৈরী করে রেখেছেন, যা শুভ্র মুশকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণময় হবে। প্রতি জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ইল্লিয়্যীন থেকে কুরসীর উপর (স্বীয় মহিমায়) অবতরণ করতঃ বেহেশতবাসীদের জন্য তজল্লী এখতিয়ার করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত দিনের মধ্যে) সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে যমীনে অবতরণ করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তওবা কবূল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দিনটি 'ইয়াওমুল-মাযীদ' (বা অতিরিক্ত পরস্কার দিবস), আসমানে ফেরেশতাগণ দিনটিকে এই নামেই জানেন, বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভের দিনও এটি।"

বর্ণিত আছে, "প্রত্যেক জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ছয় লক্ষ দোযখীকে মুক্তি দান করেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "জুমু'আর দিন যদি নিরাপদ (পাপাচার ও আপদমুক্ত) থাকে, তবে (সপ্তাহের) অবশিষ্ট দিনগুলোও নিরাপদ থাকবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ সূর্যটি ঢলার পূর্বমুহূর্তে আকাশের মাঝখানে যখন থাকে, প্রতিদিন সেই সময় দোযখের আগুন উত্তপ্ত করা হয়, কাজেই তোমরা তখন নামায পড়ো না—তবে জুমু'আর দিন ব্যতীত। কেননা, জুমু'আর পূর্ণ দিনই নামাযের জন্য—এদিন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না।"

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলন— "আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন মক্কা-কে, সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযান মাস-কে, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জুমু'আর দিন-কে এবং সমস্ত রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন শবে-কদর-কে।"

কথিত আছে, পক্ষীকুল এবং পোকা-মাকড় পর্যন্ত জুমু'আর দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ "সালাম, সালাম, শুভদিন।"

হুযূর আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাত্রে মারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য শহীদের সমতুল সওয়াব লিখে দেন এবং কবরের ফেতনা থেকে তাকে রক্ষা করেন।

অধ্যায় ঃ ৯৪

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রচুর হক ও অধিকার রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদা সদয় ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবে। স্ত্রীর কোন আচরণ অপছন্দ হলে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করবে ; কারণ বুদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে তারা অপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ج

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।" (নিসা ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

"আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।" (নিসা ঃ ২১)

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

"(তোমরা সদ্ব্যবহার কর) সহচরদের সাথেও।" (নিসা ঃ ৩৬)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'সহচরদের' দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের অন্তিম সময়ে যখন তাঁর জবান মুবারক আড়ষ্ট ও আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছিল—তখন ওসীয়ত করেছিলেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ اللّٰهَ

اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّهُنَّ عَوَانٌ فِىْ اَيْدِيْكُمْ ۔

"নামায, নামায। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীকে তাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে কখনও বোঝা চাপিয়ো না। স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের হক আদায়ের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় কর ; তারা বস্তুতঃ তোমাদের হাতে বন্দী।"

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করার বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্র বিধান ও আমানতের অধীনে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র দেওয়া বাক্যের মাধ্যমেই তাদের গোপনাঙ্গ তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুসীবতের উপর হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের ছবর-সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়ার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন।"

মনে রেখো— স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার হক আদায় নয় ; বরং প্রকৃত হক আদায় ও সদ্ব্যবহার হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার ও কষ্ট প্রদান হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা, সে ক্রোধান্বিত হলে বা উত্তেজিত হলে তা অম্লান বদনে সয়ে নেওয়া। এ ব্যাপারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুকরণ করা চাই। তাঁর বিবিগণ কখনও তাঁর সাথে তর্ক করতেন কিংবা তাদের কেউ তাঁর থেকে পৃথক একাকীত্বেও রাত্রি যাপন করেছেন।

একদা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর স্ত্রী তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তিনি যখন বললেন—কিহে! তুমি আমার সাথে তর্ক করছো? হযরত উমরের স্ত্রী বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ যে ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তর্ক করেন ; অথচ তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আমি কেন অপরাধী হবো? হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ বড় দুর্ভাগ্য

হবে হাফ্সার যদি সে হুযূরের সাথে তর্ক করে থাকে। অতঃপর তিনি (আপন কন্যা) হযরত হাফ্সাকে বল্লেন ঃ "আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকরের কন্যার (আয়েশার) প্রতি তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ হিংসার উদ্রেক না হয়। মনে রেখো—সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র—এমনিভাবে তিনি হযরত হাফ্সাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্কের বিষয়ে সতর্ক করে আরও উপদেশ দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, একদা হুযূরের কোন স্ত্রী তাঁর বুকে জোরে হাত মেরে ধাক্কার ন্যায় দিয়েছিলেন। এ জন্যে স্ত্রীর মাতা তাকে শাসন করে ধমক দিচ্ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন ঃ তাকে ছেড়ে দিন ; তারা তো আমার সাথে এর চেয়ে আরও অধিক করে থাকে।

একদা হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বাদানুবাদ হয়। তাঁরা দু'জনেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-কে মধ্যস্থ (সালিস-বিচারক) সাব্যস্ত করে তাঁকে খবর দিলে তিনি উপস্থিত হলেন। হুযূর বল্লেন ঃ হে আয়েশা! তুমি আগে বলবে না আমি আগে বলবো? হযরত আয়েশা বল্লেন ঃ আপনিই আগে বলুন এবং দেখুন-সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে পদাঘাত করলেন, ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে এল। আর বললেন ঃ ওহে নিজের দুশমন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনও অসত্য বলতে পারেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর পিছন পার্শ্বে গিয়ে বসে রইলেন। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন ঃ হে আবূ বকর! তোমাকে আমরা এই কাজ করার জন্য ডাকি নাই এবং এটা আমার পছন্দও নয়।

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) রাগ হয়ে কথার ভিতর বলে ফেলেছেন ঃ আপনি তো মনে করেন যে, খুব আল্লাহ্র নবী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এ ছিল তাঁর স্ত্রীর সাথে সুন্দর সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ। (এ সব ক্ষেত্রে নুবুওয়তের শানে বে-আদবী, অস্বীকৃতি, কিংবা অন্য কোন

ধরণের প্রশ্নই উঠে না ; এ ছিল তাদের মধ্যকার অম্ল-মধুর সম্পর্কের অভিব্যক্তি; খাঁটী ঈমানদারের জন্য তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বল্তেন ঃ আমি তোমার সন্তোষ কি ক্রোধের অবস্থা পূবাহ্নেই আঁচ করতে পারি। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ; আপনি কিরূপে তা বুঝতে পারেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তুমি যখন খুশী থাক, তখন কথা বলতে গিয়ে বল ঃ না, মুহাম্মদের প্রভুর কসম, আর যখন রাগান্বিত থাক তখন বল ঃ না, ইব্রাহীমের প্রভুর কসম। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বল্লেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন আমি কেবল আপনার নামটাই উচ্চারণ করি না। (কিন্তু আপনার মহব্বত ও প্রেম-ভক্তি আমার অন্তঃকরণে গেঁথে থাকে)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে তাঁর বিবিগণের মধ্যে প্রথম হযরত আয়েশার মহব্বতই হয়েছে। তিনি বলতেন ঃ "হে আয়েশা! আবূ যরা' তার স্ত্রীর জন্য যেমন ছিল, আমিও তোমার পক্ষে তদ্রূপ। তবে আমি তোমাকে তালাক দিবো না।"

হুযূর আলাইহিস্ সালাম তাঁর অন্যান্য বিবিগণকে বলতেন ঃ তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না ; কেননা, আল্লাহ্র কসম-তোমাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সাথে শয্যাগ্রহণ অবস্থায় আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। (সুতরাং তাঁর মর্তবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই উঁচু)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং ছোটদের প্রতি সকল মানুষ অপেক্ষা দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিগণের সাথে নেহাৎ সরল-সহজ ও সাদা-সিধা আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাদের সাথে কথা, কার্যে ও চরিত্রে উদার নীতি অবলম্বন করে চলতেন। তিনি তাদের সাথে কৌতুক-আনন্দও করতেন। একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এতে হযরত আয়েশা অগ্রগামী হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে পুনরায় একবার যখন প্রতিযোগিতা হয়, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। এবার তিনি বল্লেন ঃ দেখ হে আয়েশা! আমি কিন্তু পূর্বেরটা শোধ করে দিলাম। বিবিদের মনে আনন্দ

প্রতিবেশীকে জ্বালাতন করে। হুযূর বললেন ঃ "সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।"

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ জ্ঞাপন করলে তিনি বললেন ঃ ছবর কর। অতঃপর আরও দু'বার এমনি হলো। চতুর্থবার হুযূর বললেন ঃ তুমি তোমার বিছানাপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ। লোকটি তাই করলো। এবার যেকোন পথচারী লোকটির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে—লোকটির এই দশা কেন? কারণ জানতে পেরে লোকেরা বলতে লাগলো—জালেম প্রতিবেশীর উপর আল্লাহ্র লা'নত। এ কথা প্রতিবেশীর গোচরীভূত হওয়ার পর সে এসে লোকটিকে অনুরোধ স্বরে বলতে লাগলো—ভাই, তুমি তোমার বিছানা-পত্র স্বস্থানে নিয়ে নাও ; আমি আর কোনদিন তোমার সাথে অসদাচরণ করবো না।

ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ "মসজিদের দরজায় এ কথা লিখে দাও ঃ "ওহে লোকসকল! আশ-পাশের চল্লিশ বাড়ীর লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশী।" ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বলেন ঃ চতুর্দিকের প্রত্যেক দিকে চল্লিশটি করে বাড়ী বুঝানো হয়েছে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোক, বাড়ী এবং ঘোড়া এই তিনের মাঝে শুভ এবং অশুভ দু'টিই রয়েছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে শুভ হচ্ছে, তার মহর কম হওয়া, সহজে বিবাহ হয়ে যাওয়া এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের হওয়া। এর অশুভ দিক হচ্ছে, মহর বেশী হওয়া, সহজে বিবাহ না হওয়া এবং দুশ্চরিত্রা হওয়া।

বাড়ীর ব্যাপারে শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, বাড়ী প্রশস্ত হওয়া, প্রতিবেশী সৎ হওয়া। আর অশুভ দিক হচ্ছে, বাড়ী সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী অসৎ হওয়া।

ঘোড়ার শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, মালিকের বশীভূত হয়ে থাকা এবং ঘোড়ার মধ্যে কোনরূপ কুঅভ্যাস না থাকা। আর অশুভ ও মন্দ দিক হচ্ছে, মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হওয়া এবং কুঅভ্যাস থাকা।

এ কথাও অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাড়া-প্রতিবেশীর

দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, সে কাউকে কষ্ট দিবে না ; বরং অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা সহ্য করাও প্রতিবেশীর দায়িত্ব। কেননা, প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার সাথে সদ্ব্যবহার তখনই প্রতিফলিত হবে যখন তার কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টে ছবর করা হবে ; কেবল কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম প্রতিবেশীর হক-আদায় নয়। অধিকন্তু প্রতিবেশীর সাথে বিনয় ও বিনম্র স্বভাব অবলম্বন করবে, তার প্রতি অনুকম্পা-অনুগ্রহ করবে— এটা জরুরী। বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন দরিদ্র প্রতিবেশী ধনী প্রতিবেশীর আচল ধরে ফেলবে এবং অভিযোগ করবে— আয় রব্ব! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন তার ধন-সম্পদ থেকে আমাকে দান করা হতে বিরত রয়েছে, কেন সে আমা থেকে তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

একদা হযরত ইব্নে মুকাফ্ফা জানতে পেলেন যে, ঋণ পরিশোধের জন্য তার প্রতিবেশী বাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছে। তিনি তাকে তা বিক্রি করতে বারণ করলেন এবং পরিমিত টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য হাদিয়া করে দিলেন।

এক বুযুর্গ তাঁর বাড়ীতে ইঁদুরের উৎপাতের কথা উল্লেখ করলে এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললো ঃ আপনি বিড়াল পোষলে সমস্যা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ এতে খুবই আশংকা রয়েছে যে, বিড়ালের ডাক শুনে ইঁদুর ভয়ে আমার বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নিবে। আমি নিজের জন্য এরূপ হওয়াটা পছন্দ করি না, তাই আমার প্রতিবেশীর জন্যে এটা কেন পছন্দ করবো? সুতরাং এ হতে পারে না।"

মোটকথা, পাড়া-প্রতিবেশীর যেসব হক ও অধিকার রয়েছে, তা মোটামুটিভাবে (সংক্ষেপে) এই যে, সাক্ষাতে তুমি আগে তাকে সালাম দিবে, অযথা আলাপ দীর্ঘ করবে না, বেশী বেশী প্রশ্নের অবতারণা করবে না, অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, মুসীবতে তাকে সান্ত্বনা দিবে, শোক-দুঃখে তাকে সঙ্গ দিবে, তার আনন্দে তুমিও আনন্দ প্রকাশ করবে ; তাকে অভিনন্দিত করবে, তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবে, তার বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে তাকাবে না ; তার গোপনীয়তা নষ্ট করবে না, তার বাড়ীর দেওয়ালে কোন পশু-ছানা বা অন্য কোন বস্তু রেখে তাকে বিরক্ত করবে না, তার সীমানাস্থিত ড্রেন বা প্রণালীতে পানি প্রবাহিত করবে না, তার আঙ্গিনায়

ধুলি-বালি বা মাটি নিক্ষেপ করবে না, তার গৃহে প্রবেশের রাস্তা সংকীর্ণ করবে না, ঘরে কিছু নিয়ে যেতে থাকলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে না, তার কোন গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গোপন করে রাখবে ; প্রচার করবে না, আপদ-বিপদে তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীর প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টি রাখবে, তার বিরুদ্ধে কোন কথায় কর্ণপাত করবে না, তার ইয্যত-সম্ভ্রম রক্ষায় তৎপর থাকবে, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখবে, পরিচারিকার প্রতি তাকাবে না, তার শিশু-সন্তানদের সাথে সবিনয় মিষ্ট-মধুর আচরণ করবে, দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ হলে মহব্বতের সাথে তাকে সৎ-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে, এমনিভাবে পার্থিব বিষয়েও তাকে সুপরামর্শ প্রদান করবে। এ হচ্ছে সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশীর মোটামুটি হকসমূহ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা কি জান প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি? সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, তার সহযোগিতায় শরীক হবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে, সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, তার মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে ; জানাযার পিছনে অনুসরণ করবে, তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে, তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, তার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উঁচু করবে না ; যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায়, তাকে যন্ত্রণা দিবে না, যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাকে কিছু দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার সন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দিবে না ; যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায়, হাঁড়িতে কিছু রান্না করার সময় ধোঁয়ায় তাকে কষ্ট দিও না ; অন্যথায় কিছু খাদ্যাংশ তার ঘরে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَتَدْرُوْنَ مَا حَقُّ الْجَارِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَهُ اللّٰهُ۔

"প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি তা কি তোমরা জান? যাঁর

হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ্‌র অনুগৃহিত ব্যক্তি ছাড়া প্রতিবেশীর পুরাপুরি হক কেউ আদায় করতে পারবে না।"

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এক গোলাম বকরীর গোশত তৈরী করছিল। তিনি তাকে বললেন, গোশত তৈরী শেষ হলে আমাদের ইহূদী প্রতিবেশী থেকে তা বন্টন করা শুরু করবে। এ কথা তিনি পর পর কয়েকবার বললেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, একই কথা আপনি আর কতবার বলবেন? তিনি বললেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তখন ভেবেছি শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।

হযরত হিশাম (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত হাসান (রাযিঃ) ইহূদী কিংবা নাসারা প্রতিবেশীকে কুরবাণীর গোশতের কিছু অংশ দেওয়াটাকে দোষণীয় কিছু মনে করতেন না।

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন ঃ আমার পরম প্রিয় বন্ধু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন ঃ

اِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَاَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ جِيْرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

"যখন তরকারী রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং প্রতিবেশীগণকে তা থেকে কিছু দাও।"

অধ্যায় ঃ ৯১

মদ্যপান ও তার শাস্তি

মদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে তিনখানি আয়াত নাযিল করেছেন। সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতখানি ঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের কোন কোন উপকারও আছে।" (বাকারাহ্ ঃ ২১৯)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন মুসলমান মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ ত্যাগ করেন নাই। পরবর্তীতে এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নামায আরম্ভ করেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুরআনের সূরা ভুল পড়তে লাগলেন। তখনই দ্বিতীয় এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না।" (নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও কোন কোন মুসলমান মদ্যপান অব্যাহত রাখেন। আবার কেউ কেউ তা পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে পুনরায় এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উটের গণ্ডদেশের একটি হাঁড় উঠিয়ে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্য করে ক্রন্দন করে শোক

ও প্রশংসা কীর্তন করতঃ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে চাদর হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং হাতে যা ছিল তা তিনি লোকটির প্রতি ছুড়ে মারলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলতে আরম্ভ করলো ঃ আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখনই মদ সম্পর্কে কুরআনের এ তৃতীয় আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো— মদ, জুয়া, মূর্তি এবং হুয়ার জন্যে তীর নিক্ষেপ এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?" (মায়েদাহ্ ঃ ৯১)

আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রাযিঃ) শেষাংশের জের ধরে স্বীয় আনুগত্য ও সমর্থন নিবেদন করে বললেন ঃ

اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا

"বিরত হলাম, বিরত হলাম।"

মদ্যপানের নিষিদ্ধতা-সম্পর্কিত প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

"মদ্যপানে অভ্যাসরত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَوَّلُ مَا نَهَانِيْ رَبِّيْ بَعْدَ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَمُلَاحَاتِ الرِّجَالِ ـ

"মূর্তিপূজার সর্বপ্রথম যে গর্হিত কাজের নিষেধাজ্ঞা আমার কাছে এসেছে তা হলো, মদ্যপান ও ঝগড়া-ফাসাদ।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যেসব লোক দুনিয়াতে মদ্যপানে একত্রিত হয়েছে, জাহান্নামে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একত্র করবেন। সেখানে তারা পরস্পর একে অপরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে বলতে থাকবে— হে অমুক! আমার সাথে (দুনিয়াতে) তুমি যে আচরণ করেছ সেজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ভাল বদলা না দিন ; জাহান্নামের এই আযাব তুমিই আমাকে পৌঁছিয়েছ। এভাবে অন্যান্যরাও বলতে থাকবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মদ পান করেছে, আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন মারাত্মক বিষ পান করাবেন, যা তার সম্মুখে আনার সাথে সাথে তার চেহারার গোশত ও চামড়া বিষপাত্রের মধ্যে খসে পড়ে যাবে। আর যখন তা তাকে পান করানো হবে তখন সর্ব শরীরের গোশত-চামড়া খসে পড়বে ; অন্যান্য দোযখীরাও এ বিষক্রিয়ায় কষ্ট বোধ করবে। ওহে লোক সকল! শুনে রাখ— যে মদ পান করে, যে এর রস বের করে, যে রস নিয়ে যায়, যে বহন করে, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে মদের মূল্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরা সকলেই এই পাপের অংশীদার ; আল্লাহ্ তা'আলা এদের নামায, রোযা, হজ্জ কবূল করবেন না যাবৎ এরা তওবা না করবে। তওবার পূর্বেই যদি এরা মারা যায়, তবে দুনিয়াতে যা পান করেছে তার প্রতি ঢোকে তাদেরকে জাহান্নামের পূঁজ পান করানো আল্লাহ্ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায়। খবরদার! খবরদার! সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম ; সর্বপ্রকার মদ হারাম।"

ইব্নু আবিদ্দুনিয়া (রহঃ) বলেন ঃ "আমি এক মদ্যপ নেশাগ্রস্তের পার্শ্ব

দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম ; দেখি—সে নিজের হাতের উপর প্রস্রাব করছে আর এ দ্বারা তার হাত ধৌত করছে যেমন উযূকারী ব্যক্তি করে থাকে। আবার সে মুখে উচ্চারণ করছে—আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি দ্বীন-ইসলামকে নূরস্বরূপ এবং পানিকে পবিত্রতার উপাদানস্বরূপ দিয়েছেন।"

আব্বাস ইব্নে মিরদাসকে জাহেলিয়াত-যুগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ আপনি মদ পান করেন না কেন ; অথচ এটা শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে? তিনি বলেছেন ঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, একটা ঘৃণ্য মূর্খতার বস্তু আমি আমার নিজ হাতে ধরবো, আবার নিজ হাতেই সেটা নিজের পেটে ভরবো ; আমি পছন্দ করি না যে, সকালে আমি সাধারণ মানুষের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবো আবার সন্ধ্যাবেলায়ই তাদের সামনে নেশাগ্রস্ত নির্বোধ-নাদান প্রতীয়মান হবো।"

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সমস্ত কুকার্যের উৎসমূল (মদ্যপান) থেকে তোমরা বেঁচে থাক। পূর্বেকার যুগের জনৈক ইবাদত-গুযার ও সাধু লোক ছিল। জন-কোলাহল থেকে দূরে বিজন এক স্থানে সে ইবাদতে মগ্ন থাকতো। একদা জনৈকা স্ত্রীলোকের তার সাথে সখ্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুবাদে কোন এক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের অজুহাতে আপন কৃতদাসের মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি তাকে খবর দিলে সে এসে উপস্থিত হয়। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্ত্রীলোকটি প্রতিটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার সাথেই ছিল একটি বালক। স্ত্রীলোকটি বললো ঃ আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকি নাই ; এটা কেবল বাহানা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি এই বালকটিকে খুন কর অথবা আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও কিংবা এক পেয়ালা মদ পান কর। অন্যথায় আমি চিৎকার দিয়ে লোকজন জড়ো করে তোমাকে অপমান করে ছাড়বো। লোকটি কোন দিশা না পেয়ে মদ্যপানে রাজী হলো। এক পেয়ালা মদ পান করে সে বলতে লাগলো ঃ আরও দাও। এভাবে সে বারবার পান করলো। অবশেষে সে স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো, এমনকি বালকটিকেও সে খুন করলো। ওহে লোক সকল! মদ্যপান পরিহার কর, তা থেকে পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে চল। আল্লাহ্র কসম, একই ব্যক্তির হৃদয়ে মদ্যপান ও ঈমান কস্মিনকালেও একত্র

হয় না ; একটি থাকে তো অপরটি বের হয়ে যায়।"

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমার এক কন্যা অসুস্থা হয়ে পড়ে। তার জন্য আমি নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) তৈরী করেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তিনি দেখলেন—খেজুরের নবীযে পাগ উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি আরজ করলাম—আমার পীড়িতা কন্যার চিকিৎসা করা। তিনি বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِيْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا -

"কোনরূপ হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য রোগ-নিরাময় রাখেন নাই।"

বর্ণিত আছে, "যখন মদ হারাম করা হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এর সর্ববিধ উপকারিতা উঠিয়ে নিয়েছেন।"

অধ্যায় ঃ ৯২

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত কাতাদাহ্ থেকে, তিনি হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক থেকে এবং তিনি হযরত মালেক ইব্‌নে সা'সাআহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট মি'রাজ-রজনীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আমি কাবা ঘরের হাতীমে[১] ছিলাম, অধিকাংশ সময় বলেছেন, পাথরের উপর শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার নিকট একজন আগন্তুক (জিব্‌রাঈল) আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি শুনেছি, হুযূর বলেছেন ঃ (অঙ্গুলি নির্দেশনা করে) আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে। এক বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জারূদকে জিজ্ঞাসা করলাম যিনি শ্রোতা হিসাবে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি দেহের কোন কোন স্থানকে উদ্দেশ্য করেছেন? তিনি বললেন ঃ গলদেশ হতে পশম পর্যন্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তিনি (জিব্‌রাঈল) আমার দিল্ বের করে ঈমানী নূর দ্বারা ভরপুর এক সোনার খাঞ্চায় রেখে আমার অন্ত্রনালী ইত্যাদি ধৌত করে পুনরায় তা যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর আমার নিকট গাধার চেয়ে বড় অথচ খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট সুদৃশ্য একটি জন্তু হাজির করা হলো। জারূদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হামযাহ্ (হযরত আনাসের উপনাম)! এটিই কি ছিল বুরাক? হযরত আনাস (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ, এটিই বুরাক—শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যতদূর যায়, এক এক পদক্ষেপে নিমিষের মধ্যে সে ততদূর পথ অতিক্রম করছিল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন,

[১] হাতীম— কা'বা ঘরেরই একাংশ, কাবা পুনঃনির্মাণের সময় তা বাইরে পড়ে গিয়েছিল এবং অদ্যাবধি সে অবস্থায়ই রয়েছে।

আমাকে সেই বুরাকের উপর আরোহন করানো হলো এবং হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে আমরা দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আসমান) পৌছে গেলাম। দরজা খোলার জন্য বলা হলে ভিতর থেকে আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর—আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন হলো, "সঙ্গে আর কে?" উত্তর—"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" পুনরায় প্রশ্ন হলো, "তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিব্‌রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন, "হাঁ"। শুনামাত্রই "মারহাবা" (খুশী হউন) ও শুভাগমন বলতে বলতে ফেরেশ্‌তা দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে (প্রথম আসমানে) ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, এই যে আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"যোগ্য ছেলে, যোগ্য নবী—খুশী থাক।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর— "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিবরাঈল (আঃ) উত্তর করলেন—"হাঁ"। শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তাঁরাও অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইয়াহ্‌য়া ও ঈসা আলাইহিমাস্ সালাম ; তাঁরা নবী আলাইহিস্ সালামের খালাতো ভাই। জিব্‌রাঈল বললেন ঃ তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তারা জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমাদের যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর আমাকে নিয়ে জিব্‌রাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে উপনীত

হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—"কে?" জিব্‌রাঈল বললেন,"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো—"সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন—"মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তারাও দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর দিলেন—"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো—"সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন—"মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন— "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্ সালাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হযরত ইদরীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো, "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত হারূন আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত হারূন, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উপনীত হলেন। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিবরাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "সালাম করুন, ইনি হযরত মূসা (আঃ)।" আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর আমি যখন ঊর্ধ্ব-পথে রওয়ানা হলাম, তখন হযরত মূসা (আঃ) ক্রন্দন করে উঠলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "এই নব্য যুবক পয়গাম্বর? আমার পরে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত বেহেশ্‌তে যাবে অনেক বেশী সংখ্যায়।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পৌছলেন সপ্তম আসমানে। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে অভ্যর্থনা জানান। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"যোগ্য ছেলে যোগ্য নবী খুশী থাক।"

অতঃপর আমাকে আরও ঊর্ধ্বলোকে "সিদ্‌রাতুল-মুনতাহা"য় পৌছানো হয়েছে। সেই বৃক্ষের একটি কুল 'হাজরে'র (এক স্থানের নাম) বিখ্যাত মটকার মত বড়। আর এক একটি পাতা যেন হাতীর এক একটি কান। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি সিদ্‌রাতুল-মুন্‌তাহা।" সেখানে দেখি চারটি নদী প্রবাহিত। জিজ্ঞাসার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, যে দুইটি নদী ভিতরের দিকে প্রবাহিত, সেই দুইটি বেহেশতের নদী। আর বহির্মুখী নদী দুইটি নীল ও ফুরাত (অর্থাৎ নীল নদ ও ফুরাত নদীর প্রতিকৃতি)।"

অতঃপর আমাকে বায়তুল-মা'মূরে প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং একবার বের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাদের পালা আসে না।

অতঃপর আমার সম্মুখে এক পেয়ালা শরাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু রেখে যেটি ইচ্ছা পান করতে আমাকে বলা হলো। আমি দুধের পেয়ালাটি শুধু গ্রহণ করি। এতদ্দর্শনে জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি দ্বীন (ধর্ম), যার উপরে আপনি এবং আপনার উম্মত কায়েম থাকবেন।"

অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। সেখান হতে ফেরার পথে মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট এলে তিনি জানতে চাইলেন— কি কি ফরয করা হয়েছে। আমি বললাম, "দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।" হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মতের দ্বারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনও সম্ভবপর হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কতই অসুবিধা ভোগ করেছি। তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা ও

তদবীরে আমি কম করি নাই। কিন্তু সবই বৃথা গিয়েছে। কাজেই আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে নামাযে আরও কিছু কম করিয়ে নিন। অতঃপর আমি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে অনুরোধ জানালে পর আল্লাহ্ তা'আলা দশ ওয়াক্ত মাফ করলেন। ফেরার পথে আবার মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শঙ্কা প্রকাশ করে আরও কিছুটা লাঘব করে নেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি আবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয় আরযী পেশ করলাম। এবার আরও দশ ওয়াক্ত নামায মওকূফ করা হলো। এবারও মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দেন। আর আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করলে আরও দশ ওয়াক্ত নামায লাঘব করে দেন। ফেরার পথে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি পূর্ববৎ আরও কিছুটা লাঘব করে নিতে বলেন। আমি পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করি। তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেওয়া হলো। পুনরায় যখন মূসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি (শুনে) পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলাম। এবার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ফিরে আসলে এবারও তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারবে না। আমি বনী ইসরাঈল-এর দরুন বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি- তাদেরকে নিয়ে আমি কতই না অসুবিধা ভোগ করেছি। কাজেই অবস্থা আমার খুব জানা আছে। সুতরাং আপনি আরও কমিয়ে নিতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বারবার গিয়ে আব্দার করেছি। এখন আমার লজ্জাবোধ হয়। আমি আর যেতে চাই না। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই আমি কবূল করে নিলাম।" এমন সময় আরশ হতেও আওয়ায আসলো ঃ

أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي -

"আমার ফরয বলবৎই রেখেছি, তবে বান্দাদের কাজ লাঘব করে দিয়েছি।"

অধ্যায় ঃ ৯৩

জুমু'আর ফযীলত

জুমু'আর দিন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতময় দিন। এই দিনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, অনুরূপ মুসলমানদের জন্য এ দিনটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ

"যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।" (জুমু'আহ্ ঃ ৯)

অতএব, জুমু'আর আযানের পর দুনিয়াবী কাজে মগ্ন না থেকে খুতবা ও নামাযের জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অনুরূপভাবে জুমু'আর জন্য বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এমন কার্যসমূহ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আমার এই দিনে এবং আমার এই স্থানে জুমু'আ ফরয করেছেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "বিনা উযরে যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে (দুর্ভাগ্যের) সিলমোহর লাগিয়ে দিবেন।" অন্য সূত্রে বর্ণিত— এমন ব্যক্তি ইসলামকে যেন স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো।

এক ব্যক্তি হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, জনৈক ব্যক্তি মারা গেছে ; সে জুমু'আ পড়তো না এবং জামাতেও হাজির হতো না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি দোযখে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি এক

মাস পর্যন্ত একই প্রশ্ন করতে থাকলো এবং ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) তাকে একই জবাব দিলেন যে, সে দোযখে যাবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—ইহূদী নাসারাদেরকে জুমু'আর এই দিনটি দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা এতে মতবিরোধ করেছে। ফলে, এ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আর আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর দিনের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, আমরা তা লাভ করেছি এবং পূর্ব থেকেই এ দিনটি এই উম্মতের জন্য রাখা হয়েছিল। এ উম্মতের জন্য দিনটি ঈদের দিন। সুতরাং এই উম্মত সকলের অগ্রবর্তী হয়ে গেল আর ইহূদী-নাসারাগণ পিছনে পড়ে গেল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ একদা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আমার নিকট তশরীফ আনলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি শুভ্র কাঁচের টুকরা; বললেন, এটি জুমু'আ—আপনার রব্ব আপনার উপর ফরয করেছেন, যাতে আপনার জন্য এবং আপনার পর উম্মতের জন্য এটি দলীল স্বরূপ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতে আমাদের জন্য কি আছে? জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, এতে এমন একটি মহামূল্যবান মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন নেক মকসূদ পূরণের জন্য সেই মুহূর্তে দো'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবূল হবে। আর যদি সেই প্রার্থিত বস্তু তার ভাগ্যে পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ না থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে তদপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু দান করবেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ সেই মুহূর্তে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ কোন অনিষ্টকর বস্তু থেকে পানাহ চায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তদপেক্ষা বড় বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আমাদের নিকট এ দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার। আখেরাতে এ দিনটিকে আমরা 'ইয়াওমুল-মাযীদ' (অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস) বলে ডাকবো। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্‌রাঈল বললেন, 'বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি স্থান তৈরী করে রেখেছেন, যা শুভ্র মুশকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণময় হবে। প্রতি জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ইল্লিয়্যীন থেকে কুরসীর উপর (স্বীয় মহিমায়) অবতরণ করতঃ বেহেশতবাসীদের জন্য তজল্লী এখতিয়ার করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত দিনের মধ্যে) সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে যমীনে অবতরণ করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তওবা কবূল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দিনটি 'ইয়াওমুল-মাযীদ' (বা অতিরিক্ত পরস্কার দিবস), আসমানে ফেরেশতাগণ দিনটিকে এই নামেই জানেন, বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভের দিনও এটি।"

বর্ণিত আছে, "প্রত্যেক জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ছয় লক্ষ দোযখীকে মুক্তি দান করেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "জুমু'আর দিন যদি নিরাপদ (পাপাচার ও আপদমুক্ত) থাকে, তবে (সপ্তাহের) অবশিষ্ট দিনগুলোও নিরাপদ থাকবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ সূর্যটি ঢলার পূর্বমুহূর্তে আকাশের মাঝখানে যখন থাকে, প্রতিদিন সেই সময় দোযখের আগুন উত্তপ্ত করা হয়, কাজেই তোমরা তখন নামায পড়ো না—তবে জুমু'আর দিন ব্যতীত। কেননা, জুমু'আর পূর্ণ দিনই নামাযের জন্য—এদিন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না।"

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলন— "আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন মক্কা-কে, সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযান মাস-কে, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জুমু'আর দিন-কে এবং সমস্ত রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন শবে-কদর-কে।"

কথিত আছে, পক্ষীকুল এবং পোকা-মাকড় পর্যন্ত জুমু'আর দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ "সালাম, সালাম, শুভদিন।"

হুযূর আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাত্রে মারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য শহীদের সমতুল সওয়াব লিখে দেন এবং কবরের ফেতনা থেকে তাকে রক্ষা করেন।

অধ্যায় ঃ ৯৪

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রচুর হক ও অধিকার রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদা সদয় ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবে। স্ত্রীর কোন আচরণ অপছন্দ হলে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করবে ; কারণ বুদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে তারা অপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ج

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।" (নিসা ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

"আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।" (নিসা ঃ ২১)

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

"(তোমরা সদ্ব্যবহার কর) সহচরদের সাথেও।" (নিসা ঃ ৩৬)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'সহচরদের' দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের অন্তিম সময়ে যখন তাঁর জবান মুবারক আড়ষ্ট ও আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছিল—তখন ওসীয়ত করেছিলেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ اللّٰهَ

اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّهُنَّ عَوَانٌ فِىْ اَيْدِيْكُمْ ـ

"নামায, নামায। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীকে তাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে কখনও বোঝা চাপিয়ো না। স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের হক আদায়ের বিষয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; তারা বস্তুতঃ তোমাদের হাতে বন্দী।"

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করার বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বিধান ও আমানতের অধীনে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া বাক্যের মাধ্যমেই তাদের গোপনাঙ্গ তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুসীবতের উপর হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের ছবর-সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়ার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন।"

মনে রেখো— স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার হক আদায় নয় ; বরং প্রকৃত হক আদায় ও সদ্ব্যবহার হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার ও কষ্ট প্রদান হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা, সে ক্রোধান্বিত হলে বা উত্তেজিত হলে তা অম্লান বদনে সয়ে নেওয়া। এ ব্যাপারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুকরণ করা চাই। তাঁর বিবিগণ কখনও তাঁর সাথে তর্ক করতেন কিংবা তাদের কেউ তাঁর থেকে পৃথক একাকীত্বেও রাত্রি যাপন করেছেন।

একদা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর স্ত্রী তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তিনি যখন বললেন—কিহে! তুমি আমার সাথে তর্ক করছো? হযরত উমরের স্ত্রী বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ যে ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তর্ক করেন ; অথচ তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আমি কেন অপরাধী হবো? হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ বড় দুর্ভাগ্য

হবে হাফ্‌সার যদি সে হুযূরের সাথে তর্ক করে থাকে। অতঃপর তিনি (আপন কন্যা) হযরত হাফ্‌সাকে বল্‌লেন ঃ "আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকরের কন্যার (আয়েশার) প্রতি তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ হিংসার উদ্রেক না হয়। মনে রেখো—সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র—এমনিভাবে তিনি হযরত হাফ্‌সাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্কের বিষয়ে সতর্ক করে আরও উপদেশ দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, একদা হুযূরের কোন স্ত্রী তাঁর বুকে জোরে হাত মেরে ধাক্কার ন্যায় দিয়েছিলেন। এ জন্যে স্ত্রীর মাতা তাকে শাসন করে ধমক দিচ্ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্‌লেন ঃ তাকে ছেড়ে দিন ; তারা তো আমার সাথে এর চেয়ে আরও অধিক করে থাকে।

একদা হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বাদানুবাদ হয়। তাঁরা দু'জনেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-কে মধ্যস্থ (সালিস-বিচারক) সাব্যস্ত করে তাঁকে খবর দিলে তিনি উপস্থিত হলেন। হুযূর বল্‌লেন ঃ হে আয়েশা! তুমি আগে বলবে না আমি আগে বলবো? হযরত আয়েশা বল্‌লেন ঃ আপনিই আগে বলুন এবং দেখুন-সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে পদাঘাত করলেন, ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে এল। আর বললেন ঃ ওহে নিজের দুশমন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনও অসত্য বলতে পারেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর পিছন পার্শ্বে গিয়ে বসে রইলেন। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্‌লেন ঃ হে আবূ বকর! তোমাকে আমরা এই কাজ করার জন্য ডাকি নাই এবং এটা আমার পছন্দও নয়।

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) রাগ হয়ে কথার ভিতর বলে ফেলেছেন ঃ আপনি তো মনে করেন যে, খুব আল্লাহ্‌র নবী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এ ছিল তাঁর স্ত্রীর সাথে সুন্দর সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ। (এ সব ক্ষেত্রে নুবুওয়তের শানে বে-আদবী, অস্বীকৃতি, কিংবা অন্য কোন

ধরণের প্রশ্নই উঠে না ; এ ছিল তাদের মধ্যকার অম্ল-মধুর সম্পর্কের অভিব্যক্তি; খাঁটী ঈমানদারের জন্য তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বল্‌তেন ঃ আমি তোমার সন্তোষ কি ক্রোধের অবস্থা পূবাহ্নেই আঁচ করতে পারি। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ; আপনি কিরূপে তা বুঝতে পারেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তুমি যখন খুশী থাক, তখন কথা বলতে গিয়ে বল ঃ না, মুহাম্মদের প্রভুর কসম, আর যখন রাগান্বিত থাক তখন বল ঃ না, ইব্‌রাহীমের প্রভুর কসম। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বল্‌লেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন আমি কেবল আপনার নামটাই উচ্চারণ করি না। (কিন্তু আপনার মহব্বত ও প্রেম-ভক্তি আমার অন্তঃকরণে গেঁথে থাকে)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে তাঁর বিবিগণের মধ্যে প্রথম হযরত আয়েশার মহব্বতই হয়েছে। তিনি বলতেন ঃ "হে আয়েশা! আবূ যরা' তার স্ত্রীর জন্য যেমন ছিল, আমিও তোমার পক্ষে তদ্রূপ। তবে আমি তোমাকে তালাক দিবো না।"

হুযূর আলাইহিস্ সালাম তাঁর অন্যান্য বিবিগণকে বলতেন ঃ তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না ; কেননা, আল্লাহ্‌র কসম-তোমাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সাথে শয্যাগ্রহণ অবস্থায় আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। (সুতরাং তাঁর মর্তবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই উঁচু)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং ছোটদের প্রতি সকল মানুষ অপেক্ষা দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিগণের সাথে নেহাৎ সরল-সহজ ও সাদা-সিধা আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাদের সাথে কথা, কার্যে ও চরিত্রে উদার নীতি অবলম্বন করে চলতেন। তিনি তাদের সাথে কৌতুক-আনন্দও করতেন। একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এতে হযরত আয়েশা অগ্রগামী হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে পুনরায় একবার যখন প্রতিযোগিতা হয়, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। এবার তিনি বল্‌লেন ঃ দেখ হে আয়েশা! আমি কিন্তু পূর্বেরটা শোধ করে দিলাম। বিবিদের মনে আনন্দ

আনয়নের জন্য তিনি এরূপ করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বজন অপেক্ষা কৌতুকী ছিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হাবাশার কিছু লোক আশূরের দিনে খেলা-ধূলা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি কি এদের খেলা-ধূলা দেখবে? আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দু' দিকে দু' হাত দরাজ করে তা ধরে রাখলেন। আমি তাঁর এক হাতের উপর চিবুক রেখে তাদের খেলা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ বস্ বস্, এখন শেষ কর। আমি বললাম—না, আরও কিছুক্ষণ দেখবো। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর দু'তিনবার তিনি আমাকে ক্ষান্ত করতে বললেন। অবশেষে আরও একবার যখন বললেন, তখন আমি ক্ষান্ত করলে তিনি তাদেরকে যেতে বললেন ; তারা চলে গেল।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমস্ত মু'মিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী এবং আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বাপেক্ষা অমায়িক ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী।

তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِيْ -

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তারা যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে উৎকৃষ্ট। আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

হযরত উমর (রাযিঃ) কঠিন হওয়া সত্ত্বেও বলছেন ঃ তোমরা নিজ গৃহে স্ত্রীদের সাথে শিশুসুলভ মন নিয়ে থাক ; পুরুষোচিত যোগ্যতার যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা দেখাবে।"

হযরত লুকমান (রহঃ) বলেন ঃ "বুদ্ধিমানের উচিত সে যেন ঘরের পরিবেশে বাচ্চার মত থাকে, আর সমাজে পুরুষের ন্যায় থাকে।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন পাষাণ হৃদয় লোককে পছন্দ করেন না।" এর অর্থ হচ্ছে, যারা আপন স্ত্রীদের সাথে

এরূপ স্বভাবের আচরণ করে এবং মনের দিক থেকে দাম্ভিক ও অহংকারী হয়।

কুরআনে ব্যবহৃত عُتُلٍّ শব্দের মর্মও তাই, অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে রুক্ষ আচরণকারী।

হযরত জাবের (রাযিঃ) জনৈকা বিধবা স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন ঃ "তুমি কুমারী কন্যা বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সাথে কৌতুক করতো।"

এক বেদুঈন মরুচারীনি স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর তার প্রশংসা করে বলছিল ঃ "গৃহে প্রবেশ করার পর তিনি সদা হাস্যমুখ থাকতেন আর বাইরে-সমাজে তিনি থাকতেন স্বল্পভাষী ও গাম্ভীর্যের অধিকারী। ঘরে যৎকিঞ্চিৎ যা-ই পেতেন খেয়ে নিতেন, ঘরের কোন বস্তু হারিয়ে গেলে তেমন কোন যোগ-জিজ্ঞাসা করতেন না।"

স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারের মধ্যে এটিও একটি যে, খোলা-মেলা, সরলতা ও বিনম্র স্বভাবের আতিশয্যে তাদের বাসনা পূরণে সীমা লংঘন না করা চাই, যার ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তোমার প্রতি ভক্তি-প্রযুক্ত ভয় দূর হয়ে যায়। বরং ন্যায়-পরায়ণ ও মধ্যপন্থী থাকা চাই এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা কায়েম থাকে—এরূপ আচরণ করা চাই। যদি তাদের থেকে শরীয়তের খেলাফ বা ইসলামী রীতি-নীতি বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তবে সাথে সাথে প্রতিবাদ ও শাসন করা চাই।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্র কসম, সর্ববিষয়ে যে ব্যক্তি স্ত্রীর কামনা-বাসনার পায়রবী করে, পরিণামে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।"

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ "অনেক সময় স্ত্রীদের কথা বা পরামর্শের বিপরীত করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে।"

জনৈক জ্ঞান-তাপসের উক্তি হচ্ছে, স্ত্রীদের সাথে তোমরা পরামর্শ কর, আবার (অনেক ক্ষেত্রে) পরামর্শের বিপরীতও কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রী-

বশীভূত পুরুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" এর কারণ হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে সে তার দাসে পরিণত হয় ; অবশেষে স্ত্রীর আজ্ঞাবহ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ধ্বংসের গহ্বরে গিয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে নারীর কর্তা বানিয়েছেন ; কিন্তু সে তা উল্টিয়ে দেয়। ফলে, সে শয়তানের অনুসারী হয়, যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط

"(শয়তান বলে,) আমি তাদেরকে আরও শিক্ষা দিবো, যেন তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয়।" (নিসা ঃ ১১৮)

পুরুষের উচিত ছিল, সে কর্তা হয়ে থাকবে, না অধীন। আল্লাহ্ পাক পুরুষদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

"পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা।" (নিসা ঃ ৩৪)

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউসুফে স্বামীকে 'সর্দার' বলে অভিহিত করেছেন, ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ـ

"এবং উভয়ে সেই রমনীর সর্দার (স্বামী)-কে দরজার নিকট দাঁড়ানো অবস্থায় পেল।" (ইউসুফ ঃ ২৫)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ "তিনটি শ্রেণী এমন রয়েছে যদি তাদের সম্মান কর, তবে তারা তোমাকে হেয় করবে ঃ ১. স্ত্রী, ২. খাদেম (চাকর), ৩. ঘোড়া।" এ উক্তির দ্বারা হযরত ইমামের উদ্দেশ্য হলো, যদি কেবল সম্মান আর সদয় ব্যবহারই করা হয়, সেইসাথে সময় সময় প্রয়োজনে কোনরূপ প্রতিবাদ ও শাসন না করা হয়, তবে পরিণতি এরূপই দাড়ায়।

অধ্যায় ঃ ৯৫

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

এ সম্পর্কিত মৌলিক ও সারকথা এই যে, বিবাহ-বন্ধন প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব-অধীনতারই একটি প্রকার। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর স্ত্রী স্বামীর জন্যে এক প্রকার আজ্ঞাবহ দাসীরূপ হয়ে যায়। তখন তার কর্তব্য হয়— স্বামীর অভীপ্সিত প্রতি কাজে আনুগত্য করা। তবে শর্ত এই যে, তা কোনরূপ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও পাপকার্য না হওয়া চাই।

স্বামীর আনুগত্যে স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব— এ সম্পর্কিত প্রচুর রেওয়ায়াত হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ـ

"যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে খুশী রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এক ব্যক্তি সফরে (প্রবাসে) গমনকালে তার স্ত্রীর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিল যে, সে তার অনুপস্থিতির সময়-কালে উপর (তলা) থেকে নীচে অবতরণ করবে না। নীচে স্ত্রীর পিতা অবস্থান করতেন। একদা তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। নীচে নেমে পিতাকে দেখা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য অনুমতি চেয়ে স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠালো। তিনি বললেন ঃ তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। এরপর পিতা মারা যান। পুনরায় অনুমতি চেয়ে লোক পাঠালে হুযুর বললেন ঃ তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। অতঃপর পিতার দাফনকার্য সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, "স্বামীর আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা

তোমার পিতাকে মাফ করে দিয়েছেন।" (বিধানটি স্বতন্ত্র ; কেননা ক্ষেত্রবিশেষে এ হুকুমের তারতম্যও হতে পারে।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّةَ رَبِّهَا۔

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, আপন সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর বাধ্য থাকে—সে তার প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

প্রণিধানযোগ্য যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর বাধ্যতার বিষয়টিকে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়াবলীর সাথে উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِيْمَاتٌ بِاَوْلَادِهِنَّ لَوْلَا مَا يَاْتِيْنَ اِلٰى اَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

"গর্ভধারীনি স্ত্রীলোক, সন্তানের মা, সন্তানকে দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকারকারীনি, সন্তানের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শনকারীনি— এরা যদি স্বামীর প্রতি অবাধ্যতার আচরণ না করে, যা সাধারণতঃ করে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে নিয়মিত নামাযী মহিলারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْنَ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ۔

"আমি জাহান্নামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি ; দেখি— সেখানের অধিকাংশ অধিবাসী নারী সমাজ। তারা জিজ্ঞাসা করলো ঃ কেন এমন হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তারা অতি মাত্রায় অভিশাপ বর্ষণ করে এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আমি জান্নাতে দৃষ্টিপাত করেছি ; দেখি— নারী সমাজ সেখানে খুবই কম। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ স্বর্ণ ও যাফরান (রঙ্গিন পোষাক) এ দুই লালের আকর্ষণ ও মোহ তাদেরকে বিমুখ করে রেখেছে।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ একজন যুবতী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এখন উঠতি বয়স ; বিয়ের জন্যে আমার পয়গাম আসছে ; কিন্তু আমি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে অপছন্দ করছি। আপনি বলুন— স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি রয়েছে? তিনি বললেন ঃ আপাদমস্তক স্বামীর শরীর পীড়িত হয়ে যদি পূঁজে ভরে যায় আর স্ত্রী তার সেবা-শুশ্রূষায় আপন জিহ্বা দ্বারা লেহন করে, তবু তার কৃতজ্ঞতা আদায় হবে না। মেয়েলোকটি বললো ঃ তাহলে কি আমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবো না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, তুমি বিবাহ বস ; কারণ এতেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, খাস্‌আম গোত্রের এক মহিলা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন বিধবা স্ত্রীলোক ; আমার বিবাহ বসার ইচ্ছা আছে, আপনি বলুন— স্বামীর হক কি? তিনি বললেন ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক হচ্ছে, সে যখন তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে, তখন সে উটের পিঠে উপবিষ্ট থাকলেও যেন তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। স্বামীর আরও হক হচ্ছে যে, তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী গৃহের কোন বস্তু কাউকে দিবে না। যদি দেয় তবে গুনাহ্ স্ত্রীর হবে আর সওয়াব স্বামীর হবে। স্বামীর আরেকটি হক হচ্ছে, তার অনুমতি ব্যতীত

স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না। যদি এরূপ করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে ; কোনরূপ সওয়াব হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔

"আমি যদি অন্য কাউকে সেজদা করতে আদেশ করতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।" কারণ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক গুরুতর।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিকটতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন তারা আপন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত তাদের নামায মসজিদে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহের অন্দর কুঠরীতে আদায়কৃত নামায (সাধারণ) গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম।" পর্দার হেফাযতের জন্যেই এ হুকুম হয়েছে। এ জন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোক স্বয়ং পর্দা ; ঘর থেকে বের হলেই শয়তান উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোকের পর্দা এগারটি ঃ বিবাহের পর স্বামী তার জন্যে একটি পর্দা ; মৃত্যুর পর কবর তার জন্যে দশটি পর্দা।"

মোটকথা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে ; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে দুটি ঃ- এক. আপন সতীত্বরক্ষা ও পর্দা পালন। দুই. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা।

আদর্শ পূর্বসূরীগণের নীতি ছিল, তাদের কেউ যখন জীবিকার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন তাদের স্ত্রী-কন্যাগণ বলতেন ঃ অবৈধ উপার্জন

থেকে বেঁচে চলবেন ; আমরা "ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে নিবো। তবুও দোযখের আগুন সহ্য করতে পারবো না।"

তাঁদেরই মধ্যকার একজনের ঘটনা— একদা সফরের এরাদা করলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এ সফর কামনা করছিল না ; তারা সে লোকের স্ত্রীকে বললো ঃ আপনি তার এ সফরে সম্মতি দিচ্ছেন কেন, অথচ তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন খরচাদি আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন না? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ আমি তার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাকে শুধু একজন ভোজন-বিলাসীই পেয়েছি ; রিযিকদাতা হিসাবে তাকে পাই নাই, বরং প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ; এ কথার উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন ; যান, কিন্তু আসল রিযিকদাতা তো রয়েছেন।

হযরত রাবেয়া বিন্‌তে ইসমাঈল (রহঃ) হযরত আহ্‌মদ ইব্‌নে আবী হওয়ারী (রহঃ)-এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তাই অসম্মতি প্রকাশ করে জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার কর্মমগ্নতার (ইবাদত-বন্দেগীর) কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে রেখেছি। হযরত রাবেয়া বল্‌লেন ঃ আমিও আপনার ন্যায় কাজে (ইবদাতে) মগ্ন থাকি ; তদুপরি আমার বিবাহের খাহেশও নাই, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী স্বামী থেকে আমি যে প্রচুর সম্পদ পেয়েছি ; আমার ইচ্ছা হয় আপনি সেগুলো আপনার অন্যান্য বন্ধুজন ও তাপসগণের মধ্যে খরচ করুন। আর সে সঙ্গে আমিও তাঁদের পরিচিতি লাভে ধন্য হই। এ ভাবে খোদা-প্রাপ্তির একটি পথ আমার জন্যে হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি বল্‌লেন ঃ তাহলে আমার শায়খ-গুরুজনের নিকট পরামর্শ করে নিই। তাঁর শায়খ হযরত আবূ সুলাইমান দাররানী (রহঃ) এতকাল তাকে বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে যারাই বিবাহ করেছে, তাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে (অর্থাৎ পার্থিব ঝামেলায় পড়ে কিছু যিকির-আযকার ও ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে)। হযরত সুলাইমান দাররানী (রহঃ) উক্ত মহিলার উক্তি ও অবস্থা জেনে তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নাও ; তিনি আল্লাহ্‌র ওলী সিদ্দীকীনদের ন্যায় উক্তি করেছেন। আহ্‌মদ ইব্‌নে আবী হাওয়ারী (রহঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁকে বিবাহ করে নিলাম। কিন্তু ঘরে আমার

স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না। যদি এরূপ করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে ; কোনরূপ সওয়াব হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি বতীত ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"আমি যদি অন্য কাউকে সেজদা করতে আদেশ করতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।" কারণ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক গুরুতর।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিকটতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন তারা আপন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত তাদের নামায মসজিদে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহের অন্দর কুঠরীতে আদায়কৃত নামায (সাধারণ) গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম।" পর্দার হেফাযতের জন্যেই এ হুকুম হয়েছে। এ জন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোক স্বয়ং পর্দা ; ঘর থেকে বের হলেই শয়তান উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোকের পর্দা এগারটি ঃ বিবাহের পর স্বামী তার জন্যে একটি পর্দা ; মৃত্যুর পর কবর তার জন্যে দশটি পর্দা।"

মোটকথা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে ; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে দুটি ঃ- এক. আপন সতীত্বরক্ষা ও পর্দা পালন। দুই. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা।

আদর্শ পূর্বসূরীগণের নীতি ছিল, তাদের কেউ যখন জীবিকার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন তাদের স্ত্রী-কন্যাগণ বলতেন ঃ অবৈধ উপার্জন

থেকে বেঁচে চলবেন ; আমরা "ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে নিবো। তবুও দোযখের আগুন সহ্য করতে পারবো না।"

তাঁদেরই মধ্যকার একজনের ঘটনা— একদা সফরের এরাদা করলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এ সফর কামনা করছিল না ; তারা সে লোকের স্ত্রীকে বললো ঃ আপনি তার এ সফরে সম্মতি দিচ্ছেন কেন, অথচ তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন খরচাদি আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন না? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ আমি তার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাকে শুধু একজন ভোজন-বিলাসীই পেয়েছি ; রিযিকদাতা হিসাবে তাকে পাই নাই, বরং প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ; এ কথার উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন ; যান, কিন্তু আসল রিযিকদাতা তো রয়েছেন।

হযরত রাবেয়া বিন্‌তে ইসমাঈল (রহঃ) হযরত আহ্‌মদ ইব্‌নে আবী হওয়ারী (রহঃ)-এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তাই অসম্মতি প্রকাশ করে জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার কর্মমগ্নতার (ইবাদত-বন্দেগীর) কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে রেখেছি। হযরত রাবেয়া বল্‌লেন ঃ আমিও আপনার ন্যায় কাজে (ইবদাতে) মগ্ন থাকি ; তদুপরি আমার বিবাহের খাহেশও নাই, কিন্তু আমার পূর্ববতী স্বামী থেকে আমি যে প্রচুর সম্পদ পেয়েছি ; আমার ইচ্ছা হয় আপনি সেগুলো আপনার অন্যান্য বন্ধুজন ও তাপসগণের মধ্যে খরচ করুন। আর সে সঙ্গে আমিও তাঁদের পরিচিতি লাভে ধন্য হই। এ ভাবে খোদা-প্রাপ্তির একটি পথ আমার জন্যে হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি বল্‌লেন ঃ তাহলে আমার শায়খ-গুরুজনের নিকট পরামর্শ করে নিই। তাঁর শায়খ হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) এতকাল তাকে বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে যারাই বিবাহ করেছে, তাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে (অর্থাৎ পার্থিব ঝামেলায় পড়ে কিছু যিকির-আযকার ও ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে)। হযরত সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) উক্ত মহিলার উক্তি ও অবস্থা জেনে তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নাও ; তিনি আল্লাহ্‌র ওলী সিদ্দীকীনদের ন্যায় উক্তি করেছেন। আহ্‌মদ ইব্‌নে আবী হাওয়ারী (রহঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁকে বিবাহ করে নিলাম। কিন্তু ঘরে আমার

বসবাস এমন ছিল যে, গোসল করা তো দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধোয়ার ফুরসৎ পায় না এমন ব্যক্তির ন্যায় শীঘ্র বের হয়ে আসতাম। পরবর্তীতে আমি আরও বিবাহ করেছি। কিন্তু এই প্রথমা স্ত্রী আমাকে উন্নত খাওয়া-দাওয়া করাতো সব সময় উৎফুল্ল রাখতো আর বলতো—যান, সদা আনন্দিত থাকুন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। শ্যাম দেশের এ হযরত রাবেয়া (রহঃ)-এর সেই মর্তবা ছিল, যে মর্তবা ছিল বসরা নিবাসী হযরত রাবেয়া বস্‌রিয়া (রহঃ)-এর।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে, স্বামীর সম্মতি না জেনে তার সম্পদে কিছুমাত্র এদিক-সেদিক করবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে, স্ত্রীলোক স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্য কাউকে কিছু খাওয়াবে না। হ্যাঁ, কোন খাদ্যবস্তু বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা ভিন্ন কথা। স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোন অভাবীকে অন্ন দান করলে, স্বামীর সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে। পক্ষান্তরে, বিনা অনুমতিতে এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে আর স্বামীর আমলনামায় সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

কন্যার প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য হচ্ছে, মাতা-পিতা তাদের প্রতিটি কন্যা-সন্তানকে পূর্বাহ্নেই শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। উন্নত আচার-ব্যবহার ও সুন্দর আচরণনীতি, স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করার প্রয়োজনীয় ও সুন্দর তরতীব ও নিয়ম-পদ্ধতি শিখাবে।

বর্ণিত আছে, হযরত উসামাহ্ বিন্‌তে খারেজাহ্ ফাযারী (রাযিঃ) তার কন্যাকে স্বামীর সোপর্দ করার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ এতদিন তুমি পাখীর বাসার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থান করছিলে। এখন তুমি একটি অপরিচিত প্রশস্ত পরিবেশে যাচ্ছ—তোমাকে এমন এক শয্যা গ্রহণ করে নিতে হবে যেটি সম্পর্কে তোমার কোনই পরিচিতি নাই। এমন সাথীকে আপন করে নিতে হবে, যার সাথে পূর্ব থেকে কোনই সম্পর্ক নাই ; সম্পূর্ণ নূতন সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাজেই তুমি তার জন্যে যমীনস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্য আসমানস্বরূপ হবে। তুমি তার জন্য বিছানাস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্য সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হবে। তুমি তার বাঁদী হয়ে যাও, সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে। কোন কাজে বা কথায় খোঁচা দিওনা বা

অতিরঞ্জন করো না, সে তোমাকে সরিয়ে দিবে। তুমি তাকে দূরে রেখো না, সে তোমাকে দূর করে দিবে। সে তোমার নিকটবর্তী হলে, তুমি তার আরও নিকটবর্তী হও। আর সে যদি তোমাকে পরিহার করে চলে, তবে তুমি তার থেকে সরে পড়। সর্বদা লক্ষ্য রাখবে— তোমা থেকে সে যেন সব সময় ভাল শুনে, ভাল দেখে, ভাল আঁচ করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত মায়মূনাহ্ (রাযিঃ) হুযূরের অনুমতি না নিয়ে নিজের বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। নির্ধারিত দিনে তার নিকট উপস্থিত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পেরে বলেছিলেন ঃ "তোমার ভাই-বোনদেরকে যদি বাঁদীটি দান করে দিতে তবে তুমি অধিক সওয়াবের ভাগী হতে।"

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ "মার্জনার দৃষ্টি রাখ, তাহলে ভালবাসা স্থায়ী হবে। আমার অসন্তোষের মুহূর্তে নিশ্চুপ থেকো, তাহলে কল্যাণ হবে, ঢোলের ন্যায় আমাকে আঘাত করো না, কারণ, জানা নাই অদৃশ্যের অন্তরালে কি লুকিয়ে রয়েছে। অধিক মাত্রায় অভিযোগ করো না, এতে ভালবাসা হ্রাস পায় ; অন্তর তোমায় অস্বীকার করতে পারে ; অন্তরের উপর আমারও হাত নাই। অন্তঃকরণে আমি যেমন ভালবাসা লক্ষ্য করেছি, তেমনি তাতে শত্রুতাও অবস্থান করে, তবে ভালবাসা শত্রুতাকে দূর করতে সক্ষম।"

অধ্যায় ঃ ৯৬

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

"পূর্ণ মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে অতঃপর তাতে সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে ; তারাই সত্যবাদী। (হুজুরাত ঃ ১৫)

হযরত নু'মান ইব্‌নে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উক্তি করলো—ইসলাম গ্রহণ করার পর হাজীদের খেদমত, তাদের পানি পান করানো, মসজিদুল-হারাম আবাদ করা ছাড়া অন্য কোন আমলের আমি প্রয়োজন মনে করি না এবং পরোয়াও করি না। অপর একজন বললো ; তুমি যে কাজগুলোর কথা বলেছো, সেগুলোর তুলনায় জিহাদ শ্রেষ্ঠ। হযরত উমর (রাযিঃ) তাদেরকে ধমকের স্বরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের কাছে বসে তোমরা এতো উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করছো?— এটা ঠিক নয়। বরং তোমরা এরূপ করতে পার যে, আজকে জুমার দিন ; নামায শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তোমাদের বিতর্কিত বিষয়টির সমাধান করে নাও। এর পরই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদে হারামের আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির আমলের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ? যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, আর সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে ; তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমান নয় ; আর যারা অবিচারক আল্লাহ্ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।" (তওবাহ্ ঃ ১৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও সাহাবায়ে কেরামসহ বসা ছিলাম ; আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি তা জানা, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করা। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ۝

"সমস্ত বস্তু আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা আসমানসমূহে আছে আর যা যমীনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মু'মিনগণ ! তোমরা এরূপ কথা কেন বলছো, যা কর না? আল্লাহ্‌র নিকট এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ যে, এরূপ কথা বল যা কর না। আল্লাহ্ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালবাসেন, যারা তার পথে এরূপ মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা একটি অট্টালিকা। (ছফ ঃ ১৪)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আয়াতখানি তিলাওয়াত করে শুনালেন।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কোন আমল বাত্লিয়ে দিন, যা করলে আমি জিহাদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করি। হুযূর বললেন ঃ এমন কোন আমল আমি দেখি না। অতঃপর (তাকে জিহাদের অধিকতর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য) বল্লেন ঃ তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ ব্যক্তি যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং কোন রকম ত্রুটি না করে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন রকম ত্রুটি না করে রোযাদার অবস্থায় থাকবে? সে বললোঃ হুযূর! এটা তো বড় কঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার; কে এমন পারবে!

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এক গোত্রের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় স্বচ্ছ পানির একটি সুন্দর ঝর্ণা দেখে বলেছেন ঃ আমি যদি জন-মানবের কোলাহল থেকে পৃথক জীবন যাপন করতাম, তাহলে এখানে এই ক্ষুদ্র গোত্রটির কাছেই আবাস করে নিতাম ; তৎক্ষণাৎ আবার বল্লেন, না ; এ বিষয়ে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বল্লেন ঃ এরূপ কখনও করো না, কারণ ঃ

فَاِنَّ مَقَامَ اَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ يُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

"আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে মগ্ন রয়েছে, বাড়ীতে অবস্থান করে সত্তর বছর ইবাদত করলে যে সওয়াব লাভ হবে, সে ব্যক্তি

তার চেয়ে বেশী সওয়াবের ভাগী হবে। তোমরা চাও না যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন? যদি চাওতাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি একবার উস্ট্রীর দুধ দোহন পরিমাণ সময় জিহাদ করবে,তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে।"

প্রণিধানযোগ্য যে, এতো উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবীকেও প্রচুর ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার জন্যে যে ক্ষেত্রে লোকারণ্যের বাইরে অবস্থানের অনুমতি দেন নাই ; বরং তাকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে জিহাদ পরিত্যাগ করে চলা আমাদের জন্য কি করে জায়েয হবে? অথচ আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর পরিমাণও খুব কম, হালাল রিযিকের ব্যাপারেও আমরা উদাসীন, তদুপরি নিয়ত ও উদ্দেশ্যও আমাদের খারাব।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ ـ

"খাঁটী নিয়তে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মর্যাদা—খাঁটী নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকেই জানেন—রোযাদার এবং খুশু-খুযূ সহকারে রুকু, সিজদা ও কিয়ামকারী নামাযী ব্যক্তির ন্যায়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।" এ হাদীসখানি শুনে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিকট খুবই ভাল লেগেছে। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাদীসখানি পুনরায় ইরশাদ করুন। তিনি পুনরায় শুনালেন এবং বললেন ঃ আরেকটি বিষয় এমন রয়েছে যেটির উপর আমল করলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার একশতটি দর্জা (পদ-মর্যাদা) বুলন্দ করেন, যার প্রতি দুই দর্জার মাঝখানে যমীন থেকে আসমানের দূরত্ব-বরাবর ব্যবধান থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে বিষয়টি কি? তিনি বল্লেন ঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্।"

অধ্যায় ঃ ৯৭

শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা

এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ হে আবূ সাঈদ (তাঁর উপনাম)! শয়তান কি ঘুমায়? তিনি মৃদু হেসে বল্লেন ঃ আরে, শয়তান যদি ঘুমাতো, তাহলে আমাদের আরাম হয়ে যেতো ; বস্তুতঃ শয়তান তার কাজে এমনই তৎপর যে, কোন মুমিন তার থেকে নিস্তার পায় না। তবে তাকে দূর্বল করা বা দমন করার জন্য উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْضِي شَيْطَانَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي سَفَرِهِ -

"প্রকৃত মুমিন সে, যে তার শয়তানকে এমন দুর্বল করে দেয়, যেমন তোমরা সফরে উটকে দূর্বল করে দাও।"

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ "সত্যিকার মু'মিনের শয়তান দূর্বল থাকে।"

হযরত কায়স্ ইব্‌নে হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন ঃ "আমার শয়তানটি নিজেই আমাকে জানিয়েছে যে, সে যখন আমার ভিতরে প্রবেশ করেছিল, তখন উটের ন্যায় তাজা ও মোটা ছিল ; কিন্তু এখন সে চড়ুই পাখীর মত ছোট্ট ও দূর্বল হয়ে গেছে।" আমি তাকে এরূপ হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে ঃ "তুমি আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা আমাকে গলিয়ে ফেলেছ।"

সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতি আছে, এমন পরহেজগার লোকদের পক্ষে শয়তানকে পরাভূত করা কঠিন কিছু নয়। তারা সাধনাব্রতী

হলে শয়তানের চোর-দরজাগুলো বন্ধ করে সহজেই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বড় বড় এবং প্রকাশ্য গুনাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার শয়তানী পথগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান কূট-কৌশল অবলম্বন করে অতি সূক্ষ্ম পথে তাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে, যেগুলো বুঝে উঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে, আত্মরক্ষা করতে পারে না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরের দিকে শয়তানের জন্য অনেকগুলো প্রবেশপথ রয়েছে, কিন্তু ফেরেশতাগণের জন্য প্রবেশপথ মাত্র একটি। এই একটি পথ অনেকগুলোর মধ্যে সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। অতএব, এ ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থা ঘন অন্ধকার রাতের সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে এমন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলছে যেটিতে প্রচুর পেঁচানো পথ রয়েছে ; যেগুলোর সঠিক দিক নির্ণয় করা সূক্ষ্ম-পরিপক্ক দৃষ্টি এবং দীপ্তিময় সূর্যের আলো ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে সূক্ষ্ম-পরিপক্ক দৃষ্টি হচ্ছে তাক্ওয়া ও খোদাভীতিময় স্বচ্ছ অন্তঃকরণ আর সূর্যের আলো হচ্ছে কুরআন ও হাদীস-আহরিত সত্যিকার জ্ঞান বা ইলম। এরই মাধ্যমে এ কঠিন ও বন্ধুর পথের পথিক তার সমূহ জটিলতা নিরসনে সক্ষম হতে পারে। নতুবা এ সমস্যার কোন অন্ত নাই।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখা টেনে বল্লেন ঃ "এটা আল্লাহ্‌র পথ।" অতঃপর সেই রেখাটির ডানে, বামে আরও কতকগুলো রেখা টানলেন। এবার বল্লেন ঃ এগুলোও পথ ; কিন্তু এর প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে সে (ধ্বংস ও বিভ্রান্তির) সে পথগুলোর দিকে আহ্বান করছে। এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

"অবশ্যই এটি আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।" (আনআম ঃ ১৫৩)

শয়তানের সূক্ষ্ম ও গোপন পথসমূহকে অনুধাবন করার জন্য আমরা এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ পেশ করছি। কিভাবে শয়তান বিজ্ঞ আলেম, ইবাদত গুজার ওলী, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রক ও পাপাচার থেকে বিরত লোকদেরকে পর্যন্ত কাত করে ফেলে, উদাহরণটি দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিভাত হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইস্রাঈল গোত্রে এক পাদ্রী ছিল। একদা ইব্লীস শয়তান তাকে প্রতারিত করার জন্য ফন্দি আঁটলো। এক বাড়ীতে এসে একটি যুবতী মেয়ের গলা টিপে ধরে। তাতে সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিলো যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীনির অব্যর্থ চিকিৎসা-তদবীর রয়েছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, তাকে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী নিজের হেফাজতে তাকে রাখতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অভিভাবকদের বার বার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং মেয়েটিকে নিজ হেফাজতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রনা দিতে লাগলো। ফলে, পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন সে পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করলো। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াস্ওয়াসাহ সৃষ্টি করলো যে, তার অভিভাবকদের নিকট তুমি কি জবাব দিবে ; তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তারা তোমাকেই দায়ী করবে, এভাবে তুমি তোমার মান-সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে পুঁতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুকে যাবে ; অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে—সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করলো। এদিকে শয়তান অভিভাবকদের নিকট এসে তাদের মনেও এ বিষয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। তারা এসে পাদ্রীর নিকট মেয়েটির খোঁজ নিল। পাদ্রী বল্লো, সে মারা গেছে। এ কথা শুনে তারা মোটেই বিশ্বাস করলো না ; পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শুলিতে নিয়ে গেল। এ সময় শয়তান তার নিকট হাজির হয়ে বললো ঃ তুমি আমাকে চিন? আমি নিজেই মেয়েটির গলা টিপে ধরেছিলাম, তার অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াস্ওয়াসাহ্ ঢেলেছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ থেকে

রক্ষা পেতে চাও, তবে আমার কথা শুনো। পাদ্রী বল্লো ঃ তোমার কথা কি? শয়তার বললো ঃ খুবই সহজ ; তুমি শুধু আমাকে দুটি সিজদা কর। পাদ্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিজদা করে কাফের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ই ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ

"এরা শয়তানের ন্যায়, যে শয়তান মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে সারে তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" (হাশর ঃ ১৬)

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইব্লীস হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন করেছিল—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন, অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বেহেশ্ত দিবেন, নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন ; সবই দেখি তারই ইচ্ছা—এটা কি কোন ইনসাফ বা ন্যায়ানুগ কাজ হলো, না তিনি জুলুম করলেন ; ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একটু চিন্তা করে বল্লেন ঃ "সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তো এটা অবশ্যই জুলুম হবে, আর যদি তিনি তাঁর নিজস্ব মর্জী অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।" এ কথা শুনে শয়তান বিফল-বিমুখ হয়ে পলায়ন করলো এবং বলতে থাকলো— "হে শাফেয়ী! এই একটি মাত্র প্রশ্নের দ্বারা আমি সত্তর হাজার আবেদ ও খোদাভীরু লোককে গোম্রাহ্ করেছি এবং উবুদিয়তের খাতা হতে তাদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি।"

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইব্লীস হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ হে নবী! আপনি বলুন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। হযরত ঈসা (আঃ) জবাব দিলেন ঃ এটা সত্য কলেমা ; কিন্তু তোর হুকুমে

আমি তা পড়বো না। এর কারণ হচ্ছে যে, ইব্‌লীস শয়তান অনেক সময় ইবাদত ও নেক কাজের মাধ্যমেও ধোকায় ফেলে। আর এরই মাধ্যমে সে অদ্যাবধি বহু আবেদ, যাহেদ, বিত্তশালী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে ধোকায় ফেলে ধ্বংস করেছে। আল্লাহ্! পাক যাকে হেফাজত করেন সেই মাহ্‌ফূজ থাকতে পারে। আয় আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তানের ধোকা-প্রতারণা হতে হিফাজত করুন ; আপনার সাথে মোলাকাতের তওফীক নসীব করুন এবং হেদায়াতের উপর কায়েম-দায়েম রাখুন।

অধ্যায় ঃ ৯৮

সামা'

['সামা' আরবী শব্দ ; অর্থ ঃ শ্রবণ করা। অভিধানে সঙ্গীত অর্থেও উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকেই এক শ্রেণীর মূর্খ ও ভণ্ড লোক গীত-বাদ্য ও নর্তন-কুর্দন জায়েয বলে প্রচারের সুযোগ নিয়েছে। অথচ, অধুনা প্রচলিত কাওয়ালী, মুর্শিদী গান বা অশ্লীল নৃত্য-গীত, ক্রীড়া-কৌতুক ও বাদ্যানুষ্ঠানের সাথে সামা'র কোনই সম্পর্ক নাই ; এগুলো সম্পূর্ণ হারাম।]

কাজী আবূ তাইয়্যিব তব্‌রী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা, হযরত সুফিয়ান সওরী রাহেমাহুমুল্লাহ ও অন্যান্য ফকীহ্‌গণের এক জামাত থেকে যেসব উক্তি নকল করেছেন, সেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা (প্রচলিত) সামা'কে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তদীয় 'আদাবুল-কাজী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে গান-বাজনা বাতিলের অন্তর্ভুক্ত, বেহুদা এবং অবশ্য হারাম কাজ ; নির্বোধ ছাড়া এহেন গর্হিত বিষয় কেউ শুনতে পারে না ; এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।"

কাজী আবূ তাহয়্যিব (রহঃ) বলেন ঃ "গায়ের মাহ্‌রাম (যার সাথে পর্দা করতে হয়) স্ত্রীলোকের সামা' শ্রবণ করা ইমাম-শাফেয়ী ও তাঁর বিজ্ঞ ফকীহ্ শাগরেদগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম—চাই স্ত্রীলোক সামনে উপস্থিত হোক বা পর্দার অন্তরালে হোক কিংবা আযাদ হোক অথবা বাঁদী হোক; সর্বাবস্থায়ই হারাম। তিনি বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর উক্তি, হচ্ছে—কোন বাঁদীর কাছ থেকে সামা'র জন্য যদি লোকজন একত্রিত হয়, তবে সেই বাঁদীর মালিক এমন নির্বোধ বলে সাব্যস্ত হবে যে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাধারণ একটি দণ্ড হাতে নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজানোও জায়েয নয় ; কারণ, এগুলো দ্বীন-বিদ্বেষী লোকদের উদ্দেশ্যমূলক আবিস্কার ; তারা চায়—এগুলোর মধ্যে

মত্ত হয়ে মানুষ কুরআন তিলাওয়াত ও আসল উদ্দেশ্যের বিষয়ে গাফেল হয়ে যাক।”

হযরত ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন ঃ হাদীসের দৃষ্টিতে নারদ বা তাস-পাশা খেলা অন্যান্য খেলার তুলনায় অধিকতর জঘন্য কাজ ; এবং আমি শত্‌রঞ্জ-দাবা খেলাকেও ঘৃণা করি ; সর্ববিধ ক্রীড়া-কৌতুককেই আমি অপছন্দ করি। কেননা, এহেন মত্ততা কোন দ্বীনদার লোকের চরিত্র হতে পারে না ; এমনকি কোন ভদ্র লোক এগুলো খেলতে পারে না।”

ইমাম মালেক (রহঃ) গান বা সঙ্গীত থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কেউ একটি বাঁদী খরিদ করার পর যদি জানতে পারে যে, এটি গায়িকা, তবে (এটা এমন একটা দোষ যে এজন্যে) সে বাদীটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারবে (এবং বিক্রেতা তা ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবে)। মদীনা মোনাওয়ারার সকল ফক্বীহ্‌গণেরও একই অভিমত।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট গান গুনাহের কাজ। ‘কূফা’বাসী সমস্ত ফক্বীহ্ ও ইমামগণের একই অভিমত—হযরত ইব্‌রাহীম নখ্‌যী হযরত শাযবী (রহঃ) প্রমুখের এই মন্তব্য ও অভিমত কাজী আবূ তাইয়্যিব তব্‌রী (রহঃ) নকল করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৯৯

বিদআত ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত থাকা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ـ

“দ্বীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা বিষয়সমূহ হতে তোমরা বেঁচে চল। কেননা, এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।”

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِ دِيْنِنَا هٰذَا مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে (যা এতে নাই), সে কথা রদ্দ্ বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।”

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ

“তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পর সৎপথ-প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধর।”

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেল যে, যে কোন বিষয় কুরআন, সুন্নাহ্ এবং আয়েম্মায়ে কেরামের ইজ্‌মা’র খেলাফ হবে, সেটাই বিদআত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার সওয়াব রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের সওয়াবও সে পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার পাপ রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী চলবে, তাদের পাপও সে পাবে।"

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ؕ

"নিঃসন্দেহে আমার এ সোজা পথ ; তোমরা এর অনুসরণ কর।"

(আন্‌আম ঃ ১৫৩)

তিনি বলেছেন ঃ "সঠিক পথ একটিই ; আর এটিই একমাত্র হেদায়াতের পথ—এ পথেরই পরিণামফল জান্নাত।"

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে আপন মোবারক হস্তে একটি রেখা টেনে বলেছেন ঃ এটি আল্লাহ্ তা'আলার সরল পথ। অতঃপর এর ডানে-বামে রেখা টেনে বলেছেন ঃ এগুলোও পথ ; কিন্তু তা শয়তানের পথ এবং প্রত্যেকটি পথে শয়তান বসে মানুষকে বিপথে ডাকছে। অতঃপর (উপরোক্ত) আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্তি করেছেন ঃ "এগুলো হচ্ছে গুম্‌রাহীর পথ।"

হযরত ইব্‌নে আতিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ "ভুল ও ভ্রান্ত পথ যেগুলো হাদীসে দেখানো হয়েছে, সেগুলো দ্বারা ইহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মবাদ এবং বিদআতী ও গুম্‌রাহ্ লোকদের পথকে উদ্দেশ্য করা

হয়েছে, যে সব বিদআতী ও গুম্‌রাহ্ লোকেরা নিজেদের চিন্তা-কল্পনা ও বে-লাগাম ইচ্ছানুযায়ী দ্বীনের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াবলীর পরিবর্তন করে এবং শরয়ী বিষয়ে অযথা তর্ক-বিতর্ক ও ভ্রান্ত গবেষণা ও আহরণে লিপ্ত হয়।"

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۔

"আমার সুন্নতের বিষয়ে যে ব্যক্তি অনাগ্রহী হয়েছে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا مِنْ اُمَّةٍ اِبْتَدَعَتْ بَعْدَ نَبِيِّهَا فِىْ دِيْنِهَا بِدْعَةً اِلَّا اَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ ۔

"যে কোন উম্মত তাদের নবী কর্তৃক আনীত দ্বীনের মধ্যে মনগড়াভাবে নতুন কোন (বিদআত) বিষয় সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই অনুপাতে তারা অপর একটি সুন্নত ধ্বংস করেছে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ اِلٰهٍ يُعْبَدُ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ هَوًى يُتَّبَعُ

"আকাশের নীচে বাতিল পূজনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় আর কোনটি নাই।"

অর্থাৎ দ্বীনের মোকাবিলায় প্রবৃত্তির অনুসরণ জঘন্যতম অপরাধ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মদের পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদআত গুম্‌রাহী।"

এ হাদীসেরই শেষাংশটি হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى.

"তোমাদের ব্যাপারে আমার ঐসব কাম-প্রবৃত্তিগত বিষয়ে ভয় হয়, যেগুলো তোমাদের পেট, লজ্জাস্থান ও মনের বে-লাগাম তাড়নার সাথে সম্পর্কিত।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.

"বিদআতী ব্যক্তি যে পর্যন্ত বিদ্আত-কার্য ত্যাগ না করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তওবার তওফীক দেন না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিদআতী ব্যক্তির রোযা, হজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ, কোন ফরজ ইবাদত কিংবা কোন নফল ইবাদত কবূল করেন না। ইসলাম থেকে সে এমনভাবে বের হয়ে যায় যেমন গোলা আটা থেকে চুল বের হয়ে আসে।

لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ لِكُلِّ عَمْرَةٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلٰى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدٰى وَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

"আমি তোমাদেরকে (দ্বীনের বিষয়ে) একটি শ্বেত-শুভ্র আলোকিত পথের উপর রেখে যাচ্ছি ; যার রাতও দিবাভাগের ন্যায় উজ্জ্বল। নিজেই ধ্বংস হতে চায় এমন লোক ছাড়া এতে কেউ পদস্খলিত হবে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কর্মক্ষমতা রয়েছে, আর এ কর্মক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ ও অবকাশও দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সুযোগ ও অবকাশ আমার সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণে লাগাবে, সেই সঠিক ও সুপথ-প্রাপ্ত হবে, আর যে অন্য কিছুতে লাগাবে, সে বিচ্যুত ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "আমার উম্মতের জন্য তিনটি বিষয়কে আমি বড় ভয় করি এক, আলেমের পদস্খলন, দুই অনুসৃত প্রবৃত্তি, তিন জালেমের শাসন।"

খেলা ও খেলার সরঞ্জাম

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ বন্ধুকে বল্লো ঃ আস, জুয়া খেলি (সে পাপ করলো অতএব ক্ষমার জন্য) সে যেন সদকা করে।

মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ ও ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নারদ (তাস-পাশা) খেলে, সে যেন আপন হাত শুকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করলো।

মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নারদ (তাস) খেলে, আবার উঠেই নামাযে দাঁড়ায়, তার উদাহরণ হচ্ছে, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে পূঁজ এবং শুকরের রক্ত দ্বারা উযূ করে নামায আদায় করলো।" অর্থাৎ তার নামায কবূল হবে না, যা অন্য রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইয়াহ্য়া ইব্নে কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; তারা তাস-পাশা খেলছিল। তখন তিনি বলেছেন ঃ "এদের অন্তঃকরণ উদাসীন, হাতগুলো অহেতুক ফুযুল কাজে

লাগানো হচ্ছে আর জিহ্বাগুলো বেহুদা কথাবার্তা বলছে।"

দীলামী (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন তোমরা হার-জিতের তীর খেলা, দাবা, পাশা বা অনুরূপ (অবৈধ) কোন খেলায় রত লোকদের পাশ দিয়ে যাও, তখন তোমরা তাদের সালাম দিও না এবং তারা তোমাদের সালাম করলে জওয়াব দিও না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "তিন ধরণের খেলা জাহেলিয়ত-যুগের 'মাইসিরে'র (জুয়া) অন্তর্ভুক্ত ঃ ক্বেমার (জুয়া), পাশা, কবুতর বাজী।"

হযরত আলী (রাযিঃ) একদা শত্‌রঞ্জ (দাবা) খেলায় মত্ত এক দল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন ঃ এগুলো আবার কোন মূর্তি যে, তোমরা এর উপর ঝুকে রয়েছ, দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলে হাত কলুষিত করা অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত হাতে রাখা উত্তম।" আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা অন্য কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছো।"

হযরত আলী (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলোয়াড় অধিকতর মিথ্যুক হয়। কেউ বলে ঃ মেরে ফেলেছি ; অথচ সে মারে নাই। কেউ বলে ঃ মরে গেছে ; অথচ মরে নাই। (অর্থাৎ একেবারে নিরর্থক ও বেহুদা কথা।)

হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাযিঃ) বলেন ঃ "একমাত্র পাপী লোকেরাই দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলে থাকে।"

জেনে রাখ—উদ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র), তানপুরা, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে গান-বাজনা ও খেলা-তামাশা করা যেগুলো আনন্দ-উল্লাস ও উত্তেজনা আনয়ন করে এসব হারাম। আল্লাহ্ পাক বেঁচে চলার তওফীক দান করুন।

অধ্যায় ঃ ১০০

রজব মাসের ফযীলত

'রজব' শব্দটি আরবী تَرْجِيْبٌ (তার্‌জীব) হতে নির্গত। অর্থ, সম্মান প্রদর্শন। এ মাসকে আসাব্ব (اَلْاَصَبُّ ঃ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস)-ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে তওবাকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রচুর রহমত বর্ষিত হয় এবং ইবাদতগুজার বান্দাদের উপর কবুলিয়তের নূর ও ফয়েজ-বরকত নাযিল হয়। এ মাসকে আসাম্ম (اَلْاَصَمُّ ঃ বধির)-ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার দরুন এ সম্পর্কিত কোন কিছু শুনা যেতো না। কেউ কেউ বলেছেন, বেহেশতে 'রজব' নামে একটি ঝর্ণা আছে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—এই পানি পান করার সুযোগ একমাত্র সেই ব্যক্তিই পাবে, যে রজব মাসে রোযা রাখে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "রজব আল্লাহ্‌র মাস, শা'বান আমার মাস এবং রমযান আমার উম্মতের মাস।"

তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে তিন অক্ষর-বিশিষ্ট রজব (رَجَبٌ)শব্দটির ر রহমতের, ج জুরম্ অর্থাৎ বান্দার গুনাহের এবং ب বারর অর্থাৎ অনুগ্রহের সংকেত বহন করে। যেন আল্লাহ্ পাক বলছেন— اَجْعَلُ جُرْمَ عَبْدِىْ بَيْنَ رَحْمَتِىْ وَبِرِّىْ (আমি আমার বান্দার গুনাহ্‌কে আমার রহমত ও অনুগ্রহের মাঝখানে রাখি)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখে রোযা রাখবে, তার আমলনামায় ষাট মাসের রোযার সওয়াব লিখা হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম হযরত

জিব্‌রাঈল (আঃ) রজবের এই সাতাইশ তারিখেই নুবুওয়তের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্‌র এই রজব-আসাম্ম মাসে একদিনও যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে রোযা রাখবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার চরম সন্তুষ্টি লাভ করবে।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বছরের মাসগুলোকে চারটি মাসের দ্বারা সৌন্দর্য দান করেছেন—যিল-ক্বদ, যিল-হজ্জ, মুহররম ও রজব। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে ; مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ তন্মধ্যে তিনটি একাধারে আর একটি ভিন্ন! আর এই ভিন্ন-স্বতন্ত্র মাসটি হচ্ছে রজব মাস।"

কথিত আছে, এক মহিলা রজব মাসে প্রতিদিন বায়তুল-মুকাদ্দাস মসজিদে বার হাজার বার সূরা 'ক্বুল হুওয়াল্লাহ্' পাঠ করতো। তার অভ্যাস ছিল রজব মাসে সে নিয়মিত পশমের কাপড় পরিধান করতো। একদা সে অসুস্থ হয়ে যায় এবং পুত্রকে সে ওসীয়ৎ করে যে, মৃত্যুর পর তার পশমের পোষাকটিও যেন তার সাথে দাফন করে দেয়। কিন্তু পুত্র সেই ওসীয়ৎ পালন না করে মৃত্যুর পর তাকে উৎকৃষ্ট কাপড়ে দাফন করেছে। অতঃপর সে একরাত্রিতে স্বপ্ন দেখলো— মা পুত্রকে বলছে, "আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, তুমি আমার ওসীয়ৎ পালন কর নাই।" পুত্র চিন্তান্বিত হয়ে মা'র পশমের লেবাসখানি কবরে রাখার জন্য আবার কবর খুঁড়লো, কিন্তু কি আশ্চর্য! মা কবরে নাই। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়ায আসলো- ওহে! তুমি কি জাননা; রজব মাসে যে আমার ইবাদত করে আমি তাকে নির্জন একাকীত্বে ফেলে রাখি না?"

বর্ণিত আছে, যারা রজব মাসে রোযা রাখে, তাদের গুনাহ্‌মাফীর জন্য ফেরেশতাকুল রজবের প্রথম জুমা-রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দো'আয় মগ্ন থাকেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি হারাম মাসে (যিল-ক্বদ, যিল-হজ্জ, মুহররম ও রজব) তিন দিন রোযা রাখবে, তারজন্য নয় বৎসর ইবাদতের সওয়াব লিখা হবে।" হযরত আনাস বলেন, "বর্ণনাটি আমি নিজ কর্ণে হুযূর থেকে শুনেছি। নতুবা আমার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক।"

হিকমত ঃ আল্লাহ্‌র সম্মানিত মাস যেমন চারটি, তেমনি শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার সংখ্যাও চার। তেমনি শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের সংখ্যাও চার। তেমনি উযূর (ফরয) অঙ্গও চারটি। এমনিভাবে শ্রেষ্ঠ তাসবীহের কালেমাও চারটি, অর্থাৎ,—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ۔

এমনিভাবে অংকের মূল স্তম্ভের সংখ্যাও চার, অর্থাৎ— একক, দশক, শতক, হাজার। অনুরূপ, সময় গণনার বড় বড় অংশও চারটি, যথা ঃ ঘন্টা, দিন, মাস, বছর। বছরের ঋতুও চারটি ঃ শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত। এমনিভাবে রোগ-ব্যাধির মৌলিক উৎসও চারটি, যথা ঃ রক্ত, পিত্ত, অম্ল, শ্লেষ্মা। খোলাফায়ে রাশেদীনের সংখ্যাও চার ঃ আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা চারটি রাতে প্রচুর পরিমাণে রহমত নাযিল করেন ঃ এক. ঈদুল আযহার রাতে। দুই. ঈদুল ফিতরের রাতে। তিন. অর্ধেক শাবানের রাতে। চার. রজবের রাতে।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি রাত্র এমন রয়েছে, যেগুলোতে কেউ দো'আ করলে তা রদ (ফেরৎ) হয় না ঃ এক, রজব মাসের প্রথম রাত্রি। দুই, শা'বান মাসের অর্ধেকের রাত্রি (১৪ই শা'বানের দিবাগত রাত্রি)। তিন, জুম'আর রাত্রি। চার ও পাঁচ, দুই ঈদের রাত্রি।"

অধ্যায় ঃ ১০১

শা'বান মাসের ফযীলত

'শা'বান' (شَعْبَان) অর্থ শাখা-প্রশাখা বের হওয়া। এ মাস প্রচুর কল্যাণ ও নেকীর মাস। তাই, এর নামকরণ হয়েছে 'শা'বান'। আরেক অর্থে 'শা'বান ঃ (شِعْب থেকে নির্গত, পাহাড়ে যাওয়ার পথ) কল্যাণের পথ।

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যখন শা'বান মাস উপস্থিত হতো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "এ মাসে তোমরা তোমাদের অন্তরকে পাক-পবিত্র করে নাও এবং নিয়তকে সঠিক করে নাও।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় একাধারে এতো অধিক রোযা রাখতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনও এমন হতো যে, একাধারে তিনি রোযা রাখছেন না, তখন আমরা মনে করতাম ; তিনি আর রোযা রাখবেন না। তাঁর অধিকাংশ রোযা হতো শাবান মাসে।"

হযরত উসামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শা'বান মাসে আপনাকে যত অধিক সংখ্যায় রোযা রাখতে দেখি, তত অন্য মাসে দেখি না, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এ (শা'বান) মাস রজব ও রমযানের মাঝখানের (ফযীলতময়) মাস ; অথচ লোকেরা এ মাসের ব্যাপারে উদাসীন। মানুষের আমলসমূহ এ মাসে রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা হয়। আমার আমল যখন পেশ করা হয়, তখন রোযা অবস্থায় থাকা আমি পছন্দ করি।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া কখনও পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখি নাই এবং শা'বান মাসে যত

অধিক সংখ্যায় রোযা রেখেছেন, তেমন অন্য কোন মাসে দেখি নাই।"

এক রেওয়ায়াতে আছে— "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।" মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে— "তিনি স্বল্প সংখ্যক দিন ব্যতীত পুরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।"

বস্তুতঃ এ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি প্রথম রেওয়ায়াতের জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে এতো বেশী রোযা রাখতেন যেন পূরা মাসটিকে ঘিরে নিতেন। সুতরাং 'পূরা মাস'-এর দ্বারা এখানে 'অধিকাংশ'-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, মুসলমানদের জন্য দুনিয়াতে যেমন দু'টি ঈদের দিন আছে, তেমনি ফেরেশ্তাদের জন্যেও আসমানে দু'টি ঈদের রাত্র আছে। মুসলমানদের জন্য ঈদুল-ফিতর ও কুরবানীর ঈদ আর ফেরেশ্তাদের জন্য শবে বরাত ও লাইলাতুল-কদর। এ জন্যেই শবে বরাত-কে 'ঈদুল-মালায়িকাহ্' নাম দেওয়া হয়েছে।"

ইমাম সুব্কী (রহঃ) তদীয় তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শবে-বরাতে ইবাদত করার ওসীলায় বছরের গুনাহ্ মাফ হয় আর জুম'আর রাতে ইবাদতের ওসীলায় সপ্তাহের গুনাহ্ মাফ হয় এবং শবে কদরে ইবাদত করলে জীবনের গুনাহ্ মাফ হয়। এ জন্যেই শবে-বরাতকে গুনাহ্-মাফীর রাত্রও বলা হয়। অনুরূপ, এ রাত্রিকে 'হায়াত বা 'জীবনের রাত্রি'ও বলা হয়। ইমাম মুনযিরী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস নকল করেছেন— "যে ব্যক্তি দুই ঈদের দুই রাত্রি এবং অর্ধ শা'বানের রাত্রি জেগে ইবাদত করবে, তার অন্তর সে দিনও (কিয়ামতের দিন) মরবে না, যেদিনটি অন্তরসমূহের মৃত্যুর দিন হবে।"

এ রাত্রিকে 'শাফায়াতের রাত্রি'ও বলা হয়। হাদীস শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য ১৩ই শা'বানের রাত্রি সুপারিশ করেছিলেন, তাতে কবূল হয়েছিল এক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৪ই শা'বানের রাত্রিতে পুনরায় সুপারিশ করেছেন, তাতে কবূল হয়েছে আরেক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৫ই শা'বানের রাত্রির সুপারিশে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ কবূলিয়ত-প্রাপ্ত হয়ে তা' পূর্ণতা লাভ করে। তবে যে সকল বান্দা উদভ্রান্ত উটের ন্যায় অবাধ্য হয়ে দূরে পলায়ন করে, তাদের জন্য কবূল হয় নাই।

এ রাত্রিকে 'মাগফিরাতের রাত্রি'ও বলা হয়। ইমাম আহমদ (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা অর্ধশা'বানের রাত্রিতে বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণাদৃষ্টি করেন এবং দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীত সকলের মাগফিরাত করে দেন ঃ এক, মুশ্‌রিক আর দ্বিতীয় হিংসুক।"

এ রাত্রিকে 'পরিত্রাণ ও মুক্তির রাত্রি'ও বলা হয়। ইব্‌নে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে আমাকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর ঘরে পাঠালেন। আমি তাঁকে (হযরত আয়েশাকে) বললাম, আপনি শীঘ্র করুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে এসেছি তিনি অর্ধশা'বানের রাত্রি সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াবলী বর্ণনা করছেন। হযরত আয়েশা বললেন, হে আনাস! বস, আমি তোমাকে অর্ধশা'বানের রাত্রি সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনাই। একদা সেই রাত্রটি ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে আমার হিস্‌সা। তিনি আমার সাথে শয্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাত্রিতে এক সময় সজাগ হয়ে আমি তাঁকে বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম। মনে মনে ভাবলাম– তাহলে কি তিনি কিব্‌তী বাঁদীর পার্শ্বে চলে গেলেন! বের হয়ে হঠাৎ আমার পা গিয়ে পড়লো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তখন লক্ষ্য করে শুনি— তিনি একাগ্র মনে বলছেন ঃ

سَجَدَ لَكَ سَوَادِىْ وَخِيَالِىْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ وَهٰذِهٖ يَدِىْ وَمَاجَنَيْتُ بِهَا عَلٰى نَفْسِىْ يَاعَظِيْمًا يُّرْجٰى لِكُلِّ عَظِيْمٍ اِغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ۔

"আয় আল্লাহ্! সর্বান্তঃকরণে— আমার দেহ আমার মুখমণ্ডল সবকিছু আপনার জন্য সেজদাবনত। আমার অন্তঃকরণ আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। এই যে আমার হাত— সে-ও আপনার প্রতি বিশ্বাসী। এ হাত ও অন্যান্য

আর যা কিছু দিয়ে আমি কোন অপরাধ করি— আমাকে মাফ করুন ; হে মহান, মহা অপরাধের ক্ষমার জন্যেও যার অনুগ্রহের আশা করা হয়– আমার বড় বড় গুনাহ্-ও মাফ করে দিন। আমার মুখমণ্ডলকে, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন, কর্ণ ও শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তি যিনি দান করেছেন— আমাকে ক্ষমা করুন।"

অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং এই দো'আ পড়লেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا مِّنَ الشِّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيًّا۔

"আয় আল্লাহ্! আপনার ভয়ে শিরক থেকে পবিত্র, গুনাহ থেকে স্বচ্ছ অন্তর আমাকে দান করুন— যার মধ্যে কুফরের লেশমাত্র না থাকে, যে অন্তর কোনদিন বঞ্চিত ও দুর্ভাগা না-হয়।"

অতঃপর তিনি পুনরায় সেজদায় গেলেন। এ সময় তাঁকে আমি এই দো'আ পড়তে শুনেছি ঃ

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ اَخِىْ دَاوٗدُ اَعْفُرُ وَجْهِىْ فِى التُّرَابِ لِسَيِّدِىْ وَحَقَّ لِوَجْهِ سَيِّدِىْ اَنْ يُّعْفَرَ

"আয় আল্লাহ্! আপনার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে আপনার রোষ ও অসন্তুষ্টি হতে পানাহ্ চাই। আপনার ক্ষমার দোহাই দিয়ে আপনার আযাব ও গজব হতে পানাহ্ চাই। আপনার দোহাই দিয়ে আপনি থেকে পানাহ্ চাই। আপনার প্রশংসা করে শেষ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। আপনি তেমনি যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন। আমি তা-ই বলি যা আমার ভাই দাউদ বলেছিলেন—আমি আমার প্রভুর জন্য আমার চেহারা মাটিতে

স্থাপন করি—এতে আমি তাঁর ক্ষমা অবশ্যই পেতে পারি।”

অতঃপর তিনি মাথা উত্তোলন করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন—আপনি কী করছেন আর আমি কি ভাবছি! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে হুমায়রা (হযরত আয়েশার অপর নাম)! তুমি কি জান না— আজকের এই রাত্রি অর্ধশা'বানের রাত্রি, এ রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী কাল্ব গোত্রের অসংখ্য ছাগলের পশমের পরিমাণ লোককে দোযখ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দান করেন, তবে ছয় শ্রেণীর লোক ব্যতীত ঃ ১। মদ্যপায়ী ২। পিতা-মাতার অবাধ্য ৩। ব্যভিচারী ৪। সম্পর্ক ছিন্নকারী ৫। ফেত্নাবাজ ৬। চুগলখোর। এক বর্ণনায় ফেতনাবাজের স্থলে প্রাণীর ছবি অংকনকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্ধশা'বানের এ রাত্রিকে ‘কিসমত ও তকদীরের রাত্রি’ বা ‘বরাতের রাত্রি’ও বলা হয়। হযরত আতা' ইব্নে ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত যারা মারা যাবে, তাদের নামের লিখিত সূচী এই অর্ধশা'বানের রাত্রিতে মউতের ফেরেশ্তার নিকট হস্তান্তর করা হয়। অথচ এই মুহূর্তে তাদের কেউ কেউ ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে থাকে, কেউ কেউ বিবাহ করতে থাকে, কেউ কেউ অট্টালিকা তৈরীতে মত্ত থাকে, এদিকে মালাকুল মউত অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহ্র হুকুম হবে আর তৎক্ষণাৎ তার জান কবজ করে নিবে।”

অধ্যায় ঃ ১০২

রমযান মাসের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর।” (বাকারাহ্ ঃ ১৮৩)

হযরত সাঈদ ইব্নে জুবাইর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের যুগেও রোযার প্রচলন ছিল ; কিন্তু তাদের রোযা হতো ইশার সময় থেকে নিয়ে পরদিন রাত্র পর্যন্ত। ইসলামের শুরুভাগেও এই নিয়মের প্রচলন ছিল।

আলেমগণের এক জামাতের অভিমত অনুযায়ী নাসারাদের উপরও রোযা ফরয ছিল এবং স্বাভাবিক গতিতে রোযার সময় হতো কখনও গ্রীষ্মকালে কখনও শীতকালে। এতে তাদের সফরে, ব্যবসা-বাণিজ্যে নানারকম ব্যাঘাত দেখা দিতো। তাই, সকলের অভিমত নিয়ে তাদের কর্তা লোকেরা শীত-গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বসন্তকালীন সময়টিকে রোযার জন্য নির্ধারিত করে নেয়, আর নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তনের এই জঘন্য পাপটি মোচনের জন্য অতিরিক্ত দশটি রোযার সংযোজন করে নেয়।

পরবর্তী সময়ে আরও ঘটনা ঘটেছে— তদানীন্তন কালে এক বাদশাহ আপন রোগমুক্তির জন্য মান্নত করেছিল, সুস্থ হলে আরও সাতটি রোযা বাড়িয়ে নিবো। পরবর্তী বাদশাহ এসে আরও তিনটি রোযা সংযোজন করে মোট পঞ্চাশটি করে নেয়। এরপর এক সময় প্লেগ-মহামারী দেখা দিলে তারা আরও দশটি রোযা বাড়িয়ে নিয়ে ষাট সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী কোন এক জাতির উপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বিস্মৃত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, সহীহ্ অভিমত অনুযায়ী 'রমযান' একটি মাসের নাম, শব্দটি رَمضَاء (রাম্যা') থেকে উদ্ভূত, অর্থ— উত্তপ্ত পাথর। আরববাসীরা তীব্র গরমের মৌসুমে রোযা রাখতো। সে সময় তারা বছরের মাসগুলোর নাম রাখে, তখন স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় এ মাসটির অবস্থান ছিল গরম মৌসুমে। তাই, এর নামকরণ হয় 'রমযান'। অন্য এক অভিমত অনুযায়ী উক্ত নামকরণের তাৎপর্য হলো— রোযা মানুষের পাপসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়। এ থেকেই রোযার মাসের নামকরণ হয় রমযান।

রমযানের রোযা ফরয হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। আমলের দিক থেকে এ রোযা যেমন অত্যাবশ্যকীয়, আকীদাগত দিক থেকেও মাহে রমযানের রোযার ফরযিয়তের প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্য। সুতরাং এ ফরযিয়তের অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের।

প্রচুর হাদীসে রমযানের রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ ـ

"যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্র উপস্থিত হয় সব জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং পূর্ণ মাসব্যাপী একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা একজন ঘোষককে হুকুম প্রদান করেন, সে এই মর্মে ঘোষণা দেয়— হে পুণ্যের আশাবাদী! অগ্রসর হও, হে অমঙ্গলকামী! পিছে হট। আরও ঘোষণা দেয়— আছে কোন ক্ষমাপ্রার্থী, তাকে ক্ষমা করা হবে। আছে কোন প্রার্থনাকারী, তার প্রার্থনা কবূল করা হবে। আছে কোন তওবাকারী, তার তওবা কবূল করা হবে। সকাল পর্যন্ত এই আহ্বান অব্যাহত থাকে। ইফতারের সময় প্রতি রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা দশ লক্ষ পাপাচারী ব্যক্তিকে মুক্তি দান করেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিলো।"

হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ তারিখে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন— "তোমাদের উপর এমন একটি মহান মাস ছায়া করছে, যার মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল-কদর। এই লাইলাতুল-কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসে তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন এবং রাত্রি জাগরণ করে (তারাবীহ্র) নামায পড়াকে পুণ্যের কাজ হিসাবে প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে একটি ফরয আদায়ের তুল্য সওয়াব পাবে। আর যে এ মাসে একটি ফরয ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায়ের সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে।

এ মাস সবরের মাস। সবরের বিনিময় জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার মাস। এ মাসে মুমিন লোকদের রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমান সওয়াব লাভ করবে, অথচ রোযাদার ব্যক্তির সওয়াবে বিন্দুমাত্রও ঘাটতি হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে অনেকেরই সামর্থ নাই যে, সে অপরকে ইফতার করাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটু দুধ বা এক ঢোক পানি বা একটি খেজুর দ্বারা ইফতার করাবে, তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা সেই সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে তৃপ্ত করে ইফতার করাবে, তার গুনাহ্ মাফ হবে, পরওয়ারদিগার আমার হাউজ থেকে তাকে এমন শরবত পান করাবেন যে, এরপর সে কোনদিন পিপাসার্ত হবে না এবং সেই রোযাদারের সমান সওয়াবও সে হাসিল করবে ; অথচ তার সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।

এ মাসের প্রথম অংশ রহমতের দ্বিতীয় অংশ মাগফেরাতের এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

যে ব্যক্তি এ মাসে আপন গোলাম ও মযদূরের (দায়িত্বের) বোঝা হালকা করে দিবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

তোমরা রমযান মাসে চারটি আমল অধিক পরিমাণে কর ; দু'টি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আর দু'টি যা না হলে তোমাদের উপায়ান্তর নাই।

প্রথম দু'টি হলো ঃ (এক,—) কালেমা তাইয়্যিবাহ্ এবং (দুই,—) এস্তেগফার বেশী বেশী করে পড়। আর দু'টি হলো ঃ (তিন,—) আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশ্‌ত চাও এবং (চার,—) দোযখ থেকে পানাহ মাগো।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

"যে ব্যক্তি খাঁটি মনে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্বের এবং পরের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।"

আরও বর্ণিত হয়েছে—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

"বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য ; রোযা ব্যতীত। কেননা, তা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান।"

কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়! রোযার ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তিনি নিজেই এর প্রতিদান।

হাদীস শরীফে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "রমযান মাসে পাঁচটি বিষয় আমার উম্মতকে এমন দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। এক—রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মুশকের সুগন্ধি হতেও বেশী সুগন্ধযুক্ত। দুই—ফেরেশতাগণ তার জন্য ইফতার পর্যন্ত গুনাহ্‌মাফীর দো'আ করতে থাকে। তিন—দুর্বৃত্ত শয়তানদেরকে এ মাসে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। চার—প্রতিদিন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং বলেন ঃ আমার নেক বান্দারা দুনিয়ার দুঃখ-ক্লেশ ছেড়ে শীঘ্রই (বেহেশতে) আসছে। পাঁচ—রমযানের শেষ রাতে রোযাদারের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ক্ষমা কি শবে কদরে হয়ে থাকে! আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ না, বরং নিয়ম হলো, মজদূর কাজ শেষ করার পরই মুজুরী পেয়ে থাকে।

অধ্যায় ঃ ১০৩

শবে কদরের ফযীলত

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনী ইসরাঈল গোত্রের এক বুযুর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল— "তিনি একাধারে এক হাজার মাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং স্বীয় উম্মতের জন্যেও সেরূপ নেকীর আশা পোষণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের লোকদের আয়ু খুব কম এবং তাদের আমলও অতি অল্প ; আপনি মেহেরবানী করে তাদের নেকী বাড়িয়ে দিন।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে এই উম্মতকে লাইলাতুল-কদর দান করলেন। এই মহান রাত্রির ইবাদত বনী ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির একাধারে হাজার মাস জিহাদ করা অপেক্ষা উত্তম। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতকে উক্ত সুযোগ বিশেষভাবে দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই।

কথিত আছে, সেই ব্যক্তির নাম ছিল শামঊন। একাধারে এক হাজার মাস তিনি ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং তার ঘোড়ার পশমও শুষ্ক হয় নাই। খোদা-প্রদত্ত ক্ষমতা ও অসম সাহসিকতায় তিনি দুশমনদের উপর হামলা চালাতেন। অতীষ্ঠ হয়ে দুশমনরা তাঁর স্ত্রীর নিকট গোপনে লোক পাঠায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে মজবুত রশি দিয়ে বেঁধে তাদের সোপর্দ করতে পারলে স্ত্রীকে একটি বড় স্বর্ণের পাত্র পরিপূর্ণ করে স্বর্ণ প্রদান করবে বলে চুক্তি করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর হাত-পা বেঁধে দিল। কিন্তু তিনি জাগ্রত হয়ে হাত-পা নাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই বাঁধন ছুটিয়ে ফেলেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী অজুহাত করে বললো, "আমি আপনার শক্তি পরীক্ষা করেছি মাত্র।" এ সংবাদ কাফেরদের

নিকট পৌঁছার পর তারা লোহার জিঞ্জীর পাঠিয়ে দিল। পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি লোহার জিঞ্জীর খুলে ফেললেন। এবার স্বয়ং ইবলীস কাফেরদের নিকট উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দিল, তোমরা স্ত্রীলোকটিকে বল, সরাসরি সেই বুযুর্গ লোকটিকে যেন সে জিজ্ঞাসা করে— এমন কি জিনিস আছে যা সেই লোক কাটতে না পারে। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ "আমার চুলের গুচ্ছ কর্তন করতে আমি অক্ষম।" তার আটটি দীর্ঘ চুলের গুচ্ছ ছিল, পথ চলার সময় তা যমীন স্পর্শ করতো। লোকটি ঘুমানোর পর স্ত্রী তার দুই পা ও দুই হাত চার চার গুচ্ছ দ্বারা বেঁধে দিল। অতঃপর কাফেররা এসে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে ছিল এক বিরাট জবাইখানা ; চার শত গজ উঁচু, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থও অনুরূপ। মাঝখানে এক বিরাট স্তম্ভ। লোকেরা তাঁর কান ও ঠোঁট কেটে দিল। তখনও সমস্ত কাফের লোকজন তাঁর সম্মুখে বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তিনি মুনাজাত করলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! এই বাঁধন ভেঙ্গে দেওয়ার শক্তি আমাকে দান কর, এই স্তম্ভ স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা দাও এবং এই অট্টালিকার নীচে চাপা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।" আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবূল করলেন— খোদা-প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে তিনি আপন বাঁধন ছুটিয়ে স্তম্ভটিকে স্থানচ্যুত করে ফেললেন। ফলে, ছাদসহ বিরাট অট্টালিকা তাদের উপর পড়ে যায়, আর সমস্ত কাফের ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি আল্লাহ্র অসীম রহমতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই জিহাদে লোকটির কি পরিমাণ সওয়াব হয়েছে, আমরা কি তা জানতে পারি? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমারও তা' অজানা।" অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রার্থনার জওয়াবে 'লাইলাতুল-কদর' দান করলেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যখন লাইলাতুল-কদর উপস্থিত হয়, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণের বিরাট দল নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং বসা বা দাঁড়ানো (যে কোন) অবস্থায় আল্লাহ্র যিকরে মগ্ন বান্দাদেরকে তারা সালাম দেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের

জন্য দো'আ করেন।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, কদরের রাত্রিতে কঙ্করের চেয়েও অধিক সংখ্যক ফেরেশতা নাযিল হোন এবং তাদের অবতরণের জন্য সেই রাত্রিতে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যেমন বর্ণিত আছে— সেই রাত্রিতে নূরের প্রাচুর্য থাকে, বিরাট তজল্লী প্রকাশ পায়, ঊর্ধ্বজগতের নানা মহিমার বিকাশ ঘটে। পৃথিবীতে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে অনেকের সম্মুখে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কেউ কেউ যমীন ও আসমানের ফেরেশতাগণকে স্পষ্ট দেখতে পান, আকাশমণ্ডলীর অন্তরায় তাদের সম্মুখ থেকে উঠে যায়। ফেরেশতাগণকে তাদের বাস্তব আকৃতিতে অবলোকন করেন, তাঁদের অনেকেই দাঁড়ানো অনেকেই বসা অনেকেই রুকূতে অনেকেই সেজদায় অনেকেই যিকর-আযকারে মগ্ন অনেকেই আল্লাহ্র শোকরে মগ্ন অনেকেই তসবীহ্ পড়া অবস্থায় আবার অনেকেই কালেমা তাইয়্যেবাহ্ পাঠরত অবস্থায় তাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হোন।

এমনিভাবে অনেক ইবাদতগুযার বান্দার সম্মুখে বেহেশত পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে— সেখানকার উন্নত মহলসমূহ, বাসগৃহাদি, হূর, নহর, বৃক্ষ, ফল, আরশ, আরশের ছাদ, আম্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের মান-মর্যাদা ও আউলিয়া কেরামের পুরস্কার তাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়। মোটকথা, তারা রীতিমত সেই ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করতে থাকেন। তাদের সম্মুখে দোযখ, দোযখের ভয়াবহ আযাব, দোযখের গর্তসমূহ ও কাফেরদের অবস্থা দৃষ্ট হয়। আবার অনেকের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত রূপ সরাসরি পরিস্ফুটিত হয়—তারা কেবল এই অসীম সত্তার দীদারেই মগ্ন হয়ে থাকেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "রমযানের সাতাইশতম রাত্রির সকাল পর্যন্ত পূর্ণ ইবাদত আমার নিকট পূর্ণ রমযান মাসের অন্যান্য সকল রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যে সকল মহিলা পূর্ণ রাত্রি জাগরণে অক্ষম তারা কি করবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তাকিয়া বা বালিশে কোনরূপ ঠেস না লাগিয়ে কিছু সময় আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকবে— তা আমার নিকট সমগ্র উম্মতের পূরা রমযান ইবাদত করা অপেক্ষা প্রিয়।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রি জাগরণ করল এবং তাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করল এবং আল্লাহ্র কাছে গুনামাফীর জন্য দো'আ করল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং সে যেন আল্লাহ্র রহমতের দরিয়াতে ডুব দিল। এইরূপ ব্যক্তি জিবরাঈল (আঃ)–এর ডানার স্পর্শ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তির এই স্পর্শ লাভ হবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

অধ্যায় ঃ ১০৪

ঈদের মাসায়েল

হিজরী শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল–ফিতরের এবং যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ ঈদুল–আযহার দিন। রমযান মাসের রোযার ইবাদত সমাপনান্তে মুসলমানগণ ঈদুল–ফিতরের মাধ্যমে আনন্দ উদ্‌যাপন করে। উভয় ঈদেই তারা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে থাকে। ঈদুল–ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখা হয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ঈদের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর নে'আমত বর্ষণ করেন। এ জন্যেই মুসলমানগণ এ দিনগুলোর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে ; এতে পরম আনন্দ উপভোগ করে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ঈদুল–ফিতরের নামায হিজরী দ্বিতীয় সনে আদায় করেছেন এবং পরবর্তীতে কখনও এই নামায পরিত্যাগ করেন নাই। তাই ঈদের নামায (অতি জরুরী) সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ (ওয়াজিব)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—"তোমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার)–বলার মাধ্যমে তোমাদের ঈদগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ঈদের দিন তিনশত বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করে এর সওয়াব সকল মৃত মুসলমানের রূহের মাগফেরাতের জন্য বখ্‌শে দিবে, এ তসবীহের বরকতে প্রত্যেকের কবরে এক হাজার নূর দাখেল হবে এবং মৃত্যুর পর এই তাসবীহ্ পাঠকারী ব্যক্তির কবরেও আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার নূর দান করবেন।"

হযরত ওহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণিত, ঈদের দিনগুলোতে ইব্‌লীস চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এ অবস্থা দেখে অন্যান্য শয়তান তার আশে–পাশে উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে ঃ হে আমাদের সর্দার! আপনার

রোষ ও অসন্তুষ্টির কারণ কি? তখন ইবলীস জওয়াবে বলে ঃ আজকের (ঈদের) এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন—এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষে উন্মত্ত রেখে আখেরাতের বিষয়ে গাফেল ও অন্যমনস্ক করে দাও।

হযরত ওহ্ব থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈদুল-ফিতরের দিনে বেহেশ্ত সৃষ্টি করেছেন এবং এ দিনেই বেহেশ্তে তূবা (আনন্দ)-বৃক্ষ রোপণ করেছেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এই দিনেই সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং এ দিনেই ফেরআউনের যাদুগরদের তওবা কবূল হয়েছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيْدِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهٗ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

"যে ব্যক্তি ঈদুল-ফিত্‌রের রাতে ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করবে, তার দেল্ সেদিন যিন্দা থাকবে যেদিন অনেকের দেল্ মরে যাবে।"

হযরত উমর (রাযিঃ) ঈদের দিন তাঁর পুত্রের পরিধানে জীর্ণ পোষাক দেখে কেঁদে ফেল্লেন। পুত্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্লেন, বৎস! অন্যান্য কিশোর-বালকরা ঈদের দিনে তোমাকে এ পোষাক পরিহিত দেখবে, আমার ভয় হয়—এতে তোমার দেল্ ভাঙ্গতে পারে। হযরত উমরের পুত্র জওয়াবে বল্লেন, আব্বাজান! দেল্ ঐ ব্যক্তিরই ভাঙ্তে পারে, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারে নাই কিংবা যে সন্তান তার মা-বাপের সন্তোষ লাভ করতে পারে নাই ; আমি তো আশা করি, আপনার সন্তুষ্টি আমার প্রতি রয়েছে এবং এ ওসীলায় আল্লাহ্ পাকও আমার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত উমর আরও কাঁদলেন, বুদ্ধিমান সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব দো'আ দিলেন।

জনৈক আরবী কবি চমৎকার বলেছেন ঃ "লোকেরা আমাকে জিজ্ঞসা

করে, কাল ঈদের দিন তুমি কী পোষাক পরিধান করবে? বলি, যে পোষাক পরিধান করলে কয়েক ঢোক পান করা যায়—দারিদ্র্য ও ছবর এ দুই পোষাকের মাঝখানে এমন একটি দেল্ অবস্থান করছে, যে দেল্‌টি প্রতি ঈদ ও জুমা'তে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করে থাকে ঃ

اَلْعِيْدُ لِيْ مَاتَمٌ اِنْ غِبْتَ يَا اَمَلِيْ
وَالْعِيْدُ اِنْ كُنْتَ لِيْ مَرْاٰى وَمُسْتَمِعًا

"হে প্রেমাস্পদ! তুমি ব্যতীত আমার ঈদ আনন্দ নয় বরং তা শোক-বিলাপ। প্রকৃত ঈদ আমার হবে যদি হে মাহ্‌বুব! তোমার দর্শন লাভ করতে পারি এবং তোমাকে কিছু শোনাতে পারি।"

বর্ণিত আছে— ঈদুল-ফিত্‌রের দিন ভোর-সকালে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের পাঠিয়ে দেন ; তাঁরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং গলিপথের মুখে দাঁড়িয়ে সজোরে আওয়ায করে ঘোষণা দিতে থাকেন— মানব ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখ্‌লূকাত যা শুনতে পায়— ওহে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা তোমাদের দয়াময় রব্বের প্রতি ঝুঁকো, অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি তোমাদেরকে দান করবেন, বড় বড় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। লোকেরা যখন নামাযের স্থানে পৌঁছে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন ফেরেশ্তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ ঐ মজদূরের কী বিনিময় হতে পারে যে তার কাজ সম্পন্ন করেছে? ফেরেশ্তাগণ বলেন, তার বিনিময় হচ্ছে, পূর্ণ প্রাপ্য তাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, বিনিময়ে আমি তাদেরকে আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করলাম।

অধ্যায় ঃ ১০৫

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব ও ফযীলত

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ইবাদত-বন্দেগীর জন্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তর দিন আর নাই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে ইবাদত করা কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তবে যদি কেউ আপন জান-মাল নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সবকিছুই আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিসর্জন দেয়।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দশ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন আর নাই। আরজ করা হলো, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও কি এর সমতুল্য নয়? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, না ; তবে সক্রিয় জিহাদের তীব্রতায় যদি কারও ঘোড়া আহত হয়ে যায় এবং খোদ মুজাহিদ যদি ধূলি-মলিন হয়ে যায়।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক যুবকের অভ্যাস ছিল যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দিতেও সে রোযা রাখতে আরম্ভ করে দিতো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরে যুবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে তোমার রোযা রাখার কারণ কি? সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউন— এ দিনগুলো পবিত্র হজ্জের প্রতীক ও হজ্জ আদায়ের মুবারক সময়— হজ্জ আদায়কারীগণের সাথে আমিও নেক আমলে শরীক হই, এই আশায় যে, তাদের সাথে আমার দো'আও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নিবেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

"তোমার এক একটি রোযার বিনিময়ে একশত গোলাম আযাদ করার, একশত উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার এবং জিহাদের সাজ-সামানে ভরপুর এক ঘোড়া জিহাদের জন্যে দেওয়ার সওয়াব রয়েছে, তন্মধ্যে ৮ই যিলহজ্জ (ইয়াওমত্-তার্‌বিয়া)-এর রোযার বিনিময়ে এক হাজার গোলাম আযাদ করার এক হাজার উট দান করার এবং সাজ-সামান সহ জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়া দান করার সমতুল্য সওয়াব রয়েছে, আবার ৯ই যিলহজ্জ (ইয়াওমুল-আরাফা)-এর রোযার বিনিময়ে দুই হাজার গোলাম আযাদ করার, দুই হাজার উট দান করার জিহাদের সাজ-সামান সহ দুই হাজার ঘোড়া দান করার সওয়াব রয়েছে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يَعْدِلُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ وَيَعْدِلُ صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ بِصَوْمِ سَنَةٍ

"আরাফা'র দিনের (৯ই যিলহজ্জ) রোযা দুই বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য আর আশূরা' (১০ই মুহর্‌রম)-এর রোযা এক বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ

"এবং আমি মূসা (আঃ)-এর সাথে ওয়াদা করেছি ত্রিশ রাত্রির এবং তা পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা।" (আ'রাফ ঃ ১৪১)

মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, সেই 'দশ' ছিল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— আল্লাহ্ তা'আলা দিনসমূহের মধ্য হতে চারটি, মাসসমূহের মধ্য হতে চারটি, নারীদের মধ্যে চারজন, সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে তাদের মধ্য হতে চারজন এবং স্বয়ং জান্নাত যে সকল নেকবান্দাদের প্রত্যাশী তাদের মধ্য হতে

চারজনকে নির্বাচন করেছেন এবং বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) জুম'আর দিন ঃ জুম'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহ্‌র কাছে যা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তা দান করবেন— সেই প্রার্থিত বস্তু দুনিয়ার হোক বা আখেরাতের হোক।

(২) আরাফার দিন ঃ (যে দিনটিতে পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়) আরাফার দিন যখন উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে ফখর করে বলেন— হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা দেখ— আমার বান্দারা উপস্থিত হয়েছে; ধুলি-মলিন অবস্থায় তাদের কেশ অগুছালো, আমার জন্যে তারা ধন-মাল খরচ করেছে শারীরিকভাবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়েছে ; তোমরা সাক্ষী থাক- আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

(৩) ঈদুল-আযহা অর্থাৎ কুরবানীর দিন ঃ ঈদুল-আযহার দিনে বান্দার কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন।

(৪) ঈদুল-ফিতরের দিন ঃ রমযান মাসের রোযা রাখার পর ঈদুল-ফিতরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে লোকজন যখন বের হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ প্রত্যেক শ্রমিক শ্রমদানের পর পারিশ্রমিক চেয়ে থাকে, আমার বান্দারা পূর্ণ মাস রোযা রেখেছে, আজকে ঈদের দিন তারা বের হয়েছে আমার কাছে পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায়। হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা সাক্ষী থাক— আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। এক আওয়াযকারী আওয়ায দিয়ে থাকে, 'হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর যে, তোমাদের গুনাহসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।"

যে চারটি মাসকে নির্বাচন করা হয়েছে, তা হচ্ছে, (১) রজব (২) যিলকদ (৩) যিলহজ্জ (৪) মুহর্‌রম।

বিশেষ মর্যাদাবান যে চারজন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন, (১) হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান (২) হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, জগতের সকল মহিলার মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন। (৩) হযরত আছিয়া বিনতে মুযাহিম, তিনি ছিলেন ফেরআউনের স্ত্রী। (৪) হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি জান্নাতবাসীনী মহিলাদের সর্দার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা।

যারা সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে— এক একজন সম্প্রদায় হতে এক একজন—সেই চারজন হচ্ছেন, (১) আরবদের মধ্য হতে সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (২) পারস্যদের মধ্য হতে হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) রোমীয়দের মধ্য হতে হযরত সুহাইব রোমী (রাযিঃ) (৪) হাবশাবাসীদের মধ্য হতে হযরত বেলাল (রাযিঃ)

জান্নাত যাদের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাদের মধ্য হতে এ চারজনকে নির্বাচন করা হয়েছে ঃ (১) হযরত আলী (রাযিঃ) (২) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) (৪) হযরত মিকদাদ ইব্‌নে আসওয়াদ (রাযিঃ)।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ৮ই যিলহজ্জে যে ব্যক্তি রোযা রাখলো, আল্লাহ্ তাকে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর কঠিন রোগ-পরীক্ষায় ছবর করার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আরাফার দিনে (৯ই যিলহজ্জে) রোযা রাখলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সওয়াবের ন্যায় সওয়াব দান করবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, যখন আরাফার দিন উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত বিস্তৃত করে দেন। এই দিনে যে পরিমাণ লোকদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, অন্য কোনদিন তা হয় না। যে ব্যক্তি আরাফা'র এই দিনে রোযা রাখলো, তার গত বৎসর ও আগামী বৎসরের গুনাহ্ মাফ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ছগীরা গুনাহ্ ; কবীরা গুনাহ্ মাফীর জন্য তওবা করতে হবে) আরাফা'র দিনের রোযার ওসীলায় গত ও আগামী এ দুই বছরের গুনাহ্ মাফ হওয়ার তাৎপর্য হলো, এ দিনটি দুই ঈদের মাঝখানে পড়েছে, মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের এ দু'টি দিন। এতে তাদের জন্যে গুনাহ্-মাফীর

চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? আর আশূরার দিনের (১০ই মুহর্‌রম) আগমন ঘটে, দুই ঈদ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর। তাই এ দিনে রোযার ওসীলায় গুনাহ্ মাফ হয় এক বৎসরের। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আশূরা'র দিনটি হচ্ছে হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য আর আরাফা'র দিনটি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তাঁর বুযুর্গী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধ্যায় ঃ ১০৬

আশূরা' দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত

[আশূরা বলতে মুহর্‌রম মাসের দশ তারিখকে বুঝায়]

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌছার পর দেখতে পেলেন যে, ইহূদীরা আশূরা'র দিনটি রোযা রাখে। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললো, এ দিনটিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে ফেরআউনের বিরুদ্ধে জয়যুদ্ধ করেছিলেন। তাই শুক্‌রিয়া ও সম্মানার্থে এ দিনটিতে আমরা রোযা রাখি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমরা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের অধিক নিকটবর্তী।" অতঃপর তিনি উম্মতকে এ দিনে রোযা রাখতে হুকুম করলেন।

আশূরা'র দিনের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কিত বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। এই দিনে হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবূল হয়, এই দিনেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখেল করা হয়। আরশ, কুরসী, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জান্নাত এই দিনেই সৃষ্টি করা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন, আগুন থেকে এই দিনেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মত ফেরআউনের যুলুম-অত্যাচার থেকে চিরমুক্ত হন এবং ফেরআউন ও তার অনুচরবর্গ সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়। এ দিনেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্মলাভ করেন, এই দিনেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইদ্রীস (আঃ)-কে উঁচু স্থানে (আসমানে) উঠানো হয়। এ দিনেই হযরত নূহ্ (আঃ)-এর জাহাজ জূদী পাহাড়ে এসে স্থির হয়, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ দিনেই হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহী দেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইয়াকূব (আঃ) চোখের জ্যোতি ফিরে পান। এ দিনেই

হযরত আইয়ূব (আঃ) জটিল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন। এ দিনেই সর্বপ্রথম আসমান থেকে যমীনে বৃষ্টিপাত হয়।

দশই মুহর্‌রম অর্থাৎ আশূরা'র দিনের রোযা পূর্বের উম্মতগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি বর্ণিত আছে যে, রমযানের পূর্বে আশূরা'র রোযা ফরয ছিল, অতঃপর রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর আশূরা'র রোযার ফরযিয়ত রহিত হয়ে যায় এবং তা নফলে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বেও এ রোযা রেখেছেন। মদীনা শরীফে তশরীফ আনয়ন করার পর তিনি এ রোযার বিষয় আরও গুরুত্ব ও জোর তাকীদ দেন এবং বলেছেন আগামী বৎসর আমি বেঁচে থাকলে মুহর্‌রমের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখবো। কিন্তু তিনি এ বৎসরই আল্লাহ্ তা'আলার পেয়ারা হয়ে গেছেন, ফলে ১০ই মুহর্‌রম ছাড়া অন্য তারিখে রোযা রাখা সম্ভব হয়ে উঠে নাই। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করেছেন।

৯ ও ১০ই মুহর্‌রম সম্পর্কে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা দশই মুহর্‌রমের পূর্বের দিন এবং পরের দিন রোযা রাখ এবং এভাবে তোমরা ইহূদীদের বিপরীত কর। কেননা ইহূদীরা কেবল ১০ই মুহর্‌রমেরই রোযা রাখে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শো'আবুল-ঈমান কিতাবে রেওয়ায়াত করেছেন, আশূরা'র দিন যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত মনে প্রশস্ত হস্তে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছর তার আয়-রোযগারে বরকত দিবেন।

আশূরা'র দিন সুরমা ব্যবহার করলে সে বৎসর সুরমা ব্যবহারকারী কোনরূপ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হবে না এবং এ দিন গোসল করলে তার কোনরূপ অসুস্থতা দেখা দিবে না—এ হাদীসটি মওজূ' ও মনগড়া, হাকেম (রহঃ) পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই দিনে সুরমা ব্যবহার করা বিদ'আত। ইব্‌নে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, সুরমা ব্যবহার করা, দানা (বীজ) ভাজা, তৈল ব্যবহার করা, খোশবূ ব্যবহার করা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মিথ্যাচারী লোকদের মনগড়া ও বানোয়াট কথাবার্তা মাত্র।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আশূরা'র দিন হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর উপর যা ঘটেছে, বস্তুতঃ তা ছিল হযরত হুসাইনের শাহাদাত ; যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ হয়েছে, আহ্‌লে বাইতগণের মধ্যে অধিকতর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর মুসীবতকে স্মরণকারী ব্যক্তি শুধু 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পড়বে। এতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার অনুসরণ হবে এবং সেই সওয়াব নসীব হবে, যার ওয়াদা আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে করেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

"তাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ তাদের রব্বের তরফ হতে, এবং সাধারণ করুণাও। আর তাঁরাই এমন লোক, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (বাকারাহ্ ঃ ১৫৭)

অতঃপর শিয়ারা যেসব অসঙ্গত ও বাজে বিষয়াদির প্রচলন ঘটিয়ে রেখেছে— যেমন মৃত ব্যক্তির গুণ-কীর্তন করে বিলাপ করা, শোক পালন করা ইত্যাদি। এসব বিষয় থেকে পুরাপুরিভাবে বেঁচে থাকবে। কেননা এসবে লিপ্ত হওয়া কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয়। বস্তুতঃ এহেন কার্যকলাপ যদি আদৌ কল্যাণকর হতো, তাহলে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)-এর মাতামহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত উপলক্ষে প্রতি বছর এসব কার্য পালন করা জরুরী হতো, কেননা তিনিই ছিলেন এর জন্যে বেশী হকদার।

অধ্যায় ঃ ১০৭

মেহমানদারী বা অতিথি পরায়ণতা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মেহমান–অতিথির প্রতি মন সংকীর্ণ করে তাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ কর না। কেননা, যে মেহমানকে ঘৃণা করলো, সে আল্লাহ্কে ঘৃণা করলো, আর যে আল্লাহ্কে ঘৃণা করলো, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণা করেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যার মধ্যে অতিথি–পরায়ণতা নাই তার মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই।"

আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বিত্তশালী লোকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোথাও গমন করছিলেন। লোকটির প্রচুর সম্পদ ও গরু–ছাগলের পাল ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহ্মানী সে করে নাই। পরবর্তীতে জনৈকা স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন ; স্ত্রীলোকটি স্বল্প পরিমাণ ছাগলের মালিক ছিল। ছাগল যবেহ্ করে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহ্মানী করলো। তখন তিনি বল্লেন ঃ "তোমরা এই দু' জনের আচরণে তারতম্য লক্ষ্য করেছ কি? বস্তুতঃ এ আখলাক ও উদার চরিত্র আল্লাহ্ তা'আলার খাছ দান; তিনি যাকে পছন্দ করেন, তাকেই এ নেয়ামত দান করেন।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মেহমানের আগমন হয়। তখন তাঁর ঘরে কিছু ছিল না। তিনি বল্লেন ঃ অমুক ইহুদীর নিকট গিয়ে বল, আমার মেহ্মান এসেছে ; রজব মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য সে যেন আমাকে কিছু আটা ধার দেয়। ইহূদী বল্লো ঃ আমার কাছে অন্য কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি আটা ধার দিবো না। আমি হুযূরকে এ কথা জানালে পর তিনি

বল্লেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি আসমানেও বিশ্বস্ত যমীনেও বিশ্বস্ত ; সে যদি (বিনা বন্ধকে) আমাকে ধার দিত, আমি অবশ্যই তা পরিশোধ করতাম। যাও, আমার যুদ্ধের এ বর্মটি নিয়ে তাঁর কাছে বন্ধক রেখে আটা ধার নিয়ে আস।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি আহার করতে ইচ্ছা করতেন, নিজের সঙ্গে আহারে শরীক করার জন্য মেহ্মানের তালাশে কখনও এক মাইল দুই মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যেতেন। তাঁকে লোকেরা উপাধি দিয়েছিল 'আবূ–য্যাইফান' অর্থাৎ অতুলনীয় অতিথি–পরায়ণ। এটা তাঁর বিশুদ্ধতম নিয়ত ও অপরিসীম এখলাসেরই কল্যাণ যে, আজও পর্যন্ত তাঁর আবাসভূমি মক্কা মুকার্‌রমায় সেই অনুপম অতিথি–পরায়ণতা অব্যাহত রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর নিকট প্রতি রাতে তিন থেকে দশ পর্যন্ত কখনও একশত পর্যন্ত অতিথি–মেহ্মানের সমাগম থাকতো। একটি রাতও মেহমান থেকে খালি যেতো না।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ঃ ঈমান কি? তিনি বলেছেন ঃ খানা খাওয়ানো এবং অধিক পরিমাণে সালামের প্রসার ঘটানো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ্–মাফী এবং আল্লাহ্র কাছে মর্তবা বুলন্দ হওয়ার জন্য এ পন্থা বলেছেন যে, "তোমরা লোকদেরকে খানা খাওয়াও, রাতে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড় যখন অন্যান্য লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কবূল হজ্জ কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ "যে হজ্জে লোকদেরকে খানা খাওয়ানো এবং হাস্যমুখে লোকদের সাথে কথা বলা রয়েছে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "যে ঘরে মেহ্মানের আগমন নাই, সে ঘরে ফেরেশতা আসে না।"

মোটকথা, খানার দাওয়াত ও আপ্যায়নের অনুকূলে অসংখ্য রেওয়ায়াত রয়েছে।

জনৈক আরবী কবি বলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে ঃ "মেহ্মানের প্রতি আমার ভালবাসা কেন হবে না, তার আগমনে আমি কেন আনন্দিত ও

উল্লসিত হবো না? অথচ মেহমান আমার গৃহে উপস্থিত হয়ে সে নিজের রিযিকই আহার করে ; অধিকন্তু সে আমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে।"

পরিপক্ক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের উক্তি হচ্ছে—কারও প্রতিদান বা অনুগ্রহ তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন তা হৃষ্টচিত্তে হাসিমুখে ও মিষ্ট ভাষার মাধ্যমে হয়।"

জনৈক কবির বক্তব্য হচ্ছে, সওয়ারী থেকে অবতরণের পূর্বেই আমি আমার অতিথির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলি ; তাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করে তুলি অথচ আমার ঘরে তখন থাকে দুর্ভিক্ষ।"

দাওয়াত-দাতা মেজ্‌বানের উচিত, সে যেন নেক ও পরহেযগার লোকদেরকেই আহ্‌বান করে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَاكُلْ اِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَلَا يَاكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ

"পরহেযগার লোকের খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্যও পরহেযগার লোক ছাড়া খেতে দিও না।" বিশেষভাবে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আপ্যায়নকারী মেজ্‌বানের জন্য এভাবে দো'আ করেছেন ঃ

اَكَلَ طَعَامَكَ الْاَبْرَارُ۔

"নেক ও সৎ লোকেরা তোমার খাদ্য আহার করুন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَاءِ

"সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা, ভোজ হচ্ছে যাতে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয়, দরিদ্রদের করা হয় না।"

সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দাওয়াত হচ্ছে, যাতে আত্মীয়-পরিজনকেও দাওয়াত করা হয়। কেননা, এতে একদিকে যেমন আত্মীয়তার হক আদায় হয়, অপরদিকে তাদের সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া থেকেও হেফাজত হয়। এমনিভাবে বন্ধুজন

ও পরিচিতজনদের মধ্যে তরতীব ও ক্রমিকতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। কেননা, (একই মজলিসে বা অনুষ্ঠানে) কিছু লোকের বিশেষ আপ্যায়নে অবশিষ্টদের মনে কষ্ট প্রদান হয়।

এমনিভাবে মেজ্‌বানের আরও উচিত, গর্ব প্রকাশ ও সুনামের জন্য যেন আপ্যায়ন করা না হয় ; বরং নিয়ত হওয়া চাই—জনাব রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা ও অনুকরণ এবং মুসলমান ভাইদের আনন্দ দান ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের লালন ও বৃদ্ধিকরণ। এমনি ভাবে যদি কারও পক্ষে দাওয়াত গ্রহণ করা মুশ্‌কিল হয়, তাকে যবরদস্তি করে বাধ্য করাও উচিত নয়। আর যে ব্যক্তির উপস্থিতি অন্যান্যদের জন্য অসহনীয় বা কোন কষ্টের কারণ হয়, তাদেরকেও একত্রে দাওয়াত করা উচিত নয়। কেবল এমন লোককেই দাওয়াত করা চাই যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে তা কবূল করে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত করে, যে তা গ্রহণ করা অপছন্দ করে, তবে এর জন্য দাওয়াতকারী ব্যক্তি গুনাহ্‌গার হবে। এতদসত্ত্বেও যদি সে দাওয়াত কবূল করে নেয়, তবে দাওয়াতকারীর দু'টি গুনাহ্‌ হবে। কেননা, অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাকে বাধ্যকরা হলো। আল্লাহ্‌-ভীতিপরায়ণ লোকদের আপ্যায়ণ করা মূলতঃ ইবাদতে তাদের শক্তি-যোগান ও সহযোগিতা করা, পক্ষান্তরে, অবাধ্য লোকদের খাওয়ানোর অর্থ হলো, না-ফরমানী ও পাপকার্যে তাদের সাহায্য করা।

জনৈক দর্জি ব্যক্তি হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেঃ আমি রাজা-বাদশাহ্‌দের পোষাক তৈরী করে দিই, এতে আমিও কি তাদের জুলুম-অত্যাচারের গুনাহের ভাগী হবো? তিনি বল্‌লেন ঃ কি বলছ? জালেমের গুনাহের ভাগী তো সে, যে তোমার কাছে সুই, সূতা ইত্যাদি সেলাই-কাজের উপাদান বিক্রি করে, আর তুমি নিজেই জালেম। দাওয়াত কবূল করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ্‌। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তা ওয়াজিবও হয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ছাগলের একটি পায়া দ্বারাও যদি আমাকে আপ্যায়ন করা হয়, কিংবা আমাকে যদি ছাগলের একটি হাতের অংশও হাদিয়া দেওয়া হয়, আমি তা কবূল করবো।"

অধ্যায় ঃ ১০৮

জানাযা, কবর ও কবরস্থান

জেনে রাখ—জানাযা প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের জন্য বড় একটা শিক্ষণীয় বিষয়, আর যারা দ্বীন ও আখেরাতের চিন্তা-চেতনার বিষয়ে গাফেল ও উদাসীন, তাদেরকে মৃত ব্যক্তির এই জানাযা মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী সকল অবস্থা ও আখেরাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু আফসূস, আজকাল অন্তরসমূহ এতো কঠিন হয়ে গেছে যে, অসংখ্য জানাযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সতর্ক হওয়া তো দূরের কথা, বরং মনের কাঠিন্য উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তারা চিরকাল কেবল অন্যদেরই জানাযা দেখতে থাকবে, কিন্তু নিজেদেরও যে শীঘ্রই জানাযার খাটলিতে শুতে হবে, এ ধ্যান-খেয়াল কারও হয় না। অথচ প্রকৃত বাস্তব সত্য যা কাউকে ক্ষমা করবে না তা হচ্ছে, এক সময় অবশ্যই এমন এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে, যখন তাদের এহেন সকল গর্ব-গুমান ভণ্ডুল প্রতীয়মান হবে। কেননা আজকে যাদের জানাযা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, একদিন তারাও ঠিক এমনি ধরণের দম্ভ-অহমে লিপ্ত ছিল, কিন্তু কই— আজকে তাদের এ অবস্থা কেন? সুতরাং প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য যে, যখনই কোন জানাযা দেখবে, তখন মনে করবে যে, এটি আমারই জানাযা ; কেননা, ঠিক এরূপই আমার জানাযাও তৈরী হতে দেরী নাই, আজ না হোক কাল, না হয় পরশু আমার মৃতদেহও এভাবে খাটলিতে করে বহন করে কবরস্থানে নিয়ে দাফন করা হবে।

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) যখনই কোন জানাযা দেখতেন, তখনই বলতেন ঃ "চল, আমিও পিছনে পিছনে আসছি।"

হযরত মাকহূল দিমাশ্কী (রহঃ) জানাযা দেখেই বলতেন ঃ "চল, আমিও আসছি ; হায়! কত বড় শিক্ষা, কিন্তু এরই পাশাপাশি দ্রুত গাফলত ও উদাসীনতাই আমাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে ; আগের জন চলে গেল অথচ পরবর্তী জনের কোনই চেতনা নাই।"

হযরত উসাইদ ইব্‌নে হুযাইর (রাযিঃ) বলেন ঃ "যখনই আমি কোন জানাযায় শরীক হয়েছি, আমার মনে একই প্রশ্ন বারবার জাগতে থাকে যে, কি হলো, এ মৃতের সাথে আরো কিরূপ ব্যবহার করা হবে?"

হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ)-এর ভাইয়ের ইনতেকাল হলে তার জানাযার পিছনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বের হলেন এবং বলতে থাকলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার চক্ষু জুড়াবে না যে পর্যন্ত জানতে না পারবো যে, তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ, আর যতক্ষণ আমি যিন্দা ততক্ষণ তা জানতে পারবো না।"

হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন ঃ "আমরা জানাযার পিছনে পিছনে যেতাম– তখন সকলেই দুঃখ-ভারাক্রান্ত থাকতাম ; কেউ বুঝতে পারতাম না যে, কে কাকে সান্ত্বনা দিবে।"

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন ঃ আমরা জানাযার পিছনে যেতাম—তখন প্রত্যেকেই বস্ত্র-খণ্ডে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকতো।"

এ ছিল তাঁদের অবস্থা ; তাঁদের অন্তরে মৃত্যুর ভয়, আখেরাতের চিন্তা। কিন্তু আফসূস! আমাদের অবস্থা এই যে, জানাযার পিছনে পিছনে আমরা যাই ; আর অধিকাংশই আমরা হাসতে থাকি, বেহুদা কথা বলতে থাকি, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় মত্ত থাকি, আত্মীয়-স্বজনেরা কে কিভাবে কোন্ প্রক্রিয়ায় তার সম্পত্তি পেতে পারে— এসব বিষয় চিন্তা-ধান্দায় মগ্ন হয়ে যায়। অনতি পরেই যে নিজের জানাযাও ঠিক এরূপে আসছে, সে বিষয়ে কেউ চিন্তা করে না— তবে যাকে আল্লাহ্ পাক তওফীক দেন সে ব্যতিক্রমভুক্ত। বস্তুতঃ এহেন গাফলত ও উদাসীনতার কারণ হচ্ছে অধিক পাপাচার ও অবাধ্যতা। যার ফলে অন্তরসমূহ প্রস্তরসম কঠিন হয়ে গেছে ; অহেতুক কার্যকলাপে জীবনপাত হচ্ছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এহেন ধ্বংসাত্মক গাফলত থেকে হেফাজত করুন।

জানাযার পিছনে অনুসরণের সময় উত্তম হলো, অনুচ্চ আওয়াজে মনের গভীরতায় কাঁদতে থাকা। মানুষ যদি আপন জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতো, তবে এই করুণ মুহূর্তে সে মৃতের জন্যে না কেঁদে নিজের উপরেই কাঁদতো— হায় জানিনা আমার কি দশা হয়!

হযরত ইব্‌রাহীম যাইয়্যাত (রহঃ) একদা লক্ষ্য করলেন, কিছু লোক জনৈক মৃতের উপর কাঁদাকাটি করছে। তিনি বললেন ঃ ওহে! তোমরা তার উপর কাঁদছো? না ; বরং নিজেদের উপর কাঁদো, সে তো তার ভয়ানক তিনটি ঘাঁটি পার হয়ে গেছে ; মালাকুল-মওত তথা মৃত্যুর ফেরেশতার চেহারা দর্শন, মৃত্যুর যন্ত্রণা, আর পরিণাম ফলের ভয়।

হযরত আবূ আমর ইব্‌নে আলা (রহঃ) বলেন ঃ "আমি হযরত জরীর (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি কাউকে কবিতার এক-দুটি পংক্তি লিখাচ্ছিলেন ; এমন সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; তৎক্ষণাৎ তিনি থেমে গেলেন আর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এসব জানাযা আমাকে পূর্বাহ্নেই বৃদ্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর নিম্নের এ পংক্তিগুলো পাঠ করলেন ঃ

تروعنا الجنائز مقبلات

ونلهو حين تذهب مدبرات

"জানাযার খাটলি সম্মুখপানে ধাবমান হয়ে আসে, আর আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা যখন দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, আমরা গাফেল-উদাসীন হয়ে যাই।"

كروعة ثلة لمغار ذئب

فلما غابت عادت راتعات

"ব্যাঘ্রের হুংকার ও আক্রমণের ভয়ে লোকেরা আতংকিত হয়, কিন্তু তা কেটে গেলে পর সেই পূর্ববৎ গাফলত ও নিশ্চিন্ত অবস্থা!"

জানাযায় উপস্থিত ও শরীক হওয়ার সময় উচিত হলো— গভীর ধ্যান ও চিন্তা করবে, বিনয় ও অবনত মস্তকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করবে যেরূপ ফেকাহ-গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। মৃতব্যক্তি ভাল-মন্দ যেরূপ লোকই হোক না কেন তুমি তার সর্বাবস্থায় সুধারণা পোষণ করবে, নিজের ব্যাপারে কুধারণা রাখবে এবং সর্বদা আশংকা বোধ করবে ; যদিও বাহ্যতঃ তোমার

অবস্থা ভাল বোধ হয়। কারণ, জানা নাই তোমার শেষ পরিণতি কি হবে- প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারে না।

হযরত উমর ইব্‌নে যর (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার জনৈক প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করে। কর্মজীবনে সে অসৎ লোক ছিল বিধায় কিছু লোক তার জানাযা থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু ইব্‌নে যর (রহঃ) তার জানাযায় শরীক হন। যখন তাকে কবরে রাখা হয়, তখন তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন ঃ "ওহে অমুকের পিতা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন— তুমি আল্লাহ্‌র তওহীদ ও একত্বে বিশ্বাসী ছিলে, সেজদায় মুখমণ্ডল ধূলায়িত করেছো ; যদিও লোকেরা বলে, তুমি পাপী ; কিন্তু পাপী আমাদের মধ্যে কে নয়। (বস্তুতঃ কেউ নিজের পরিত্রাণের বিষয় নিশ্চিন্ত হতে পারে না।)

কথিত আছে, বসরার কোন এক অঞ্চলে জনৈক দুষ্ট ও উশৃংখল প্রকৃতির লোক মারা যায়। তার জানাযা উঠানোর জন্য একজন লোকও সাহায্যকারী পাওয়া যায় নাই। কেননা, তার দুশ্চরিত্রের কারণে কেউ কোনদিন তার খোঁজ-খবর রাখে নাই ; এখন মৃত্যুর পর তার জানাযা উঠানোর বিষয়েও কারও কোন সদিচ্ছা বা আগ্রহ নাই। একমাত্র তার স্ত্রীই ছিল ব্যবস্থাপক। স্ত্রী দুজন শ্রমিকের মাধ্যমে জানাযা ময়দানে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখানে কেউ তার নামাযে উপস্থিত হলো না। অবশেষে স্ত্রী তাকে দাফন করার জন্য বিজন মরুভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে অদূরেই একটি পাহাড়ের উপর ছিলেন একজন ইবাদত-গুযার আল্লাহ্‌র ওলী-বুযুর্গ। তিনি দেখলেন, জানাযা প্রস্তুত। নামাযের উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসলেন। তৎক্ষণাৎ গোটা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, অমুক বুযুর্গ অমুক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য শহরবাসীরা এসে উপস্থিত হয়ে গেল। তিনি সকলকে নিয়ে সেই লোকের জানাযা পড়লেন। লোকেরা অবাক বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে গেছে যে, একজন ফাসেক ও দুরাচারী লোকের জানাযা তিনি পড়লেন। তাদের এ বিস্ময়ের জবাবে বুযুর্গ বলেছেন ঃ "আমাকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে যে, তুমি অমুক স্থানে যাও ; সেখানে একটি জানাযা দেখবে, মৃতব্যক্তির স্ত্রী ছাড়া তার সাথে আর কেউ থাকবে না। তুমি সে লোকটির জানাযার নামায পড়ে

দাও, কেননা আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" লোকেরা এ কথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। অতঃপর সেই বুযুর্গ স্ত্রীলোকটিকে উপস্থিত করে তার স্বামীর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বললো ঃ আমার স্বামী নামকরা মদ্যপায়ী লোক ছিল, প্রায় সময়েই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকতো। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার জানা মতে তার কোন নেক আমল ছিল কি? সে বললো ঃ তিনটি বিষয় তার মধ্যে ছিল ঃ এক. প্রতিদিন সকালে নেশা-অবস্থা থেকে হুঁশে এসেই কাপড়-চোপড় বদলিয়ে উযূ করে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতো। দুই. তার ঘরে সর্বদা এক-দুইজন এতীম অবশ্যই থাকতো, যাদেরকে সে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাসতো ; যখনই তারা এদিক-সেদিক চলে যেতো সে অস্থির হয়ে তাদেরকে তালাশ করে বের করতো। তিন. রাতের অন্ধকারে মাঝে-মধ্যে মদমত্ততা থেকে নিস্কৃত হয়ে সে কাঁদতো আর বলতো ঃ "আয় আল্লাহ্! আমার মত এই জঘন্য পাপী ও দুরাচারীকে দিয়ে তুমি জাহান্নামের কোন্ কোণাটুকু ভরবে?" এই প্রশ্নোত্তরে সকলের কাছেই বিষয়টুকু খুলে গেল এবং সেই বুযুর্গও সেখান থেকে চলে গেলেন।

হযরত যাহ্হক (রহঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা দুনিয়াত্যাগী কে? তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কবর এবং কবরস্থিত আযাবের কথা কখনও বিস্মৃত হয় না, পার্থিব সাধ-অভিলাষ সম্পূর্ণ বর্জন করে চলে, চিরস্থায়ী জীবনকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, আগত পরবর্তী মুহূর্তটিরও কোন আশা-ভরসা করে না এবং নিজকে সর্বদা কবরবাসীদের একজন বলে গণ্য করে।"

হযরত আলী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কি ব্যাপার—আপনি কবরবাসীদের প্রতিবেশী হয়ে গেছেন ; কেবল সেখানেই পড়ে থাকেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে অতি উত্তম ও সৎ প্রতিবেশী রূপে পেয়েছি-তারা সম্পূর্ণ নির্বাক ; অথচ আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

হযরত উসমান (রাযিঃ) কোন কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেই কাঁদতে আরম্ভ করতেন, এমনকি তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে— জান্নাত ও জাহান্নামের কত আলোচনাই তো আপনি করেন, কিন্তু

তখনও আপনাকে এরূপ কাঁদতে দেখা যায় না ; অথচ কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়েই আপনি অনবরত কাঁদতে থাকেন? তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কবরই হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, যদি এই প্রথম মঞ্জিলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে তার মুক্তি না হয়, তবে পরবর্তী সবগুলো মঞ্জিল তার জন্য আরও কঠিনতর হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইব্‌নে আস (রাযিঃ) একদা একটি কবরস্থান দেখে সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো— ইতিপূর্বে এরূপ করতে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই ; এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ "কবরবাসীদের আমি দেখলাম, তাদের এবং আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন অন্তরায় নাই, কাজেই দুই রাকআত নামাযের মাধ্যমে আমিও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ব্রতী হলাম।"

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ "সর্বপ্রথম আদম-সন্তানের সাথে তার গর্ত (কবর) কথা বলে। সে বলে— আমি (বিষাক্ত) সাপ-বিচ্ছুর ঘর, আমি নির্জন একাকীত্বের ঘর, আমি অপরিচিত-অচেনা ঘর, আমি ঘোর অন্ধকার ঘর ; আমি তোমার জন্য এগুলোই প্রস্তুত রেখেছি, বল— তুমি কি প্রস্তুত করে এনেছো?

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে আমার সর্বাপেক্ষা অসহায়ত্ব ও মোহ্তাজীর দিনটি বলবো? সে দিনটি হচ্ছে, যে দিন আমাকে কবরে রাখা হবে।"

অধ্যায় ঃ ১০৯

দোযখ-আযাবের ভয়

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আখানি বেশী বেশী করতেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রবব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (বাকারাহ্ ঃ ২০১)

মুসনাদে আবূ ইয়া'লা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে বলেছেন ঃ ওহে লোক সকল! তোমরা বিরাট দুটি বিষয় অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা কখনও ভুলো না। এ কথা বলে তিনি এতো কাঁদলেন যে, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের উভয় পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অতঃপর আরও বললেন ঃ কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি জানতে আমি যা জানি, তবে আবাদি ছেড়ে তোমরা বিজন এলাকায় ছুটে পালাতে এবং ভয়-আতংকে দিশাহারা হয়ে আপন আপন মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে।

ত্ববরানী আওসাতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এমন এক সময় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি ইতিপূর্বে কখনও উপস্থিত হন নাই। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিব্‌রাঈল! আপনার কি হয়েছে, আপনাকে এরূপ বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের

অগ্নি উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন, তারপরেই আমি আপনার নিকট এসে হাজির হলাম। নবীজী বললেন ঃ দোযখের কিছু বিবরণ আপনি আমাকে শুনান। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করলে সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে, দোযখের অগ্নি শুভ্র বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আবার হুকুম করলেন। এবারও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। ফলে সে লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় দোযখকে আরও উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করেন। অতএব দোযখের অগ্নি আরও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন অন্ধকার কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোন শেষ নাই এবং এর লেলিহানেরও কোন অবধি নাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঐ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন— সুইয়ের ফুটো পরিমাণ অংশও যদি দোযখের ছিদ্র হয়ে যায়, তবে জগতের সমস্ত মানুষ ভয়ে আতংকে মরে যাবে। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের প্রহরীদের একজনও যদি দুনিয়াবাসীর সম্মুখে প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী এর ভয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের শিকলসমূহের এমন একটিও যদি দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয় যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে, তবে পাহাড়সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে আর শিকলটি যমীনের সর্বশেষ সীমানায় গিয়ে থেমে যাবে। নবীজী বললেন ঃ হে জিবরাঈল! ক্ষান্ত হও, আর বলো না ; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে ; আর আমি এখনই মৃত্যুবরণ করবো। এ কথা বলে নবীজী হযরত জিবরাঈলের প্রতি তাকিয়ে দেখলেন— তিনি কাঁদছেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) আরজ করলেন, আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরও বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার বর্তমান অবস্থার স্থলে অন্য কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কি উপায় হবে, তা আমি জানি না। আমি জানি না— ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমার উপরও এসে

পতিত না হয়, অথচ সেও ফেরেশতা ছিল। জানি না— হারূত ও মারূতের উপর যেভাবে আপদ এসেছে, আমার উপরও সেরূপ এসে না পড়ে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-ও কাঁদতে লাগলেন, এভাবে উভয়ই কাঁদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো— হে জিবরাঈল! হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উভয়কে তাঁর নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) উর্ধ্বজগতে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, কয়েকজন আনসারী সাহাবী ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন ঃ তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের মাথার উপর রয়েছে জাহান্নাম, আমি যা জেনেছি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুবই কম হাসতে এবং অধিক মাত্রায় ক্রন্দন করতে, খাওয়া-দাওয়া তোমাদের কাছে ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও উজাড় জঙ্গলে আল্লাহ্র তালাশে তোমরা বের হয়ে যেতে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো— হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করো না, তোমাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি, হতাশ করার জন্য নয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা সকলে মধ্য ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও এবং হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেও না।"

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ হে জিবরাঈল! আমি হযরত মিকাঈলকে কখনও হাসতে দেখি নাই ; এর কারণ কি? তিনি বললেনঃ যখন থেকে দোযখ বানানো হয়েছে, তখন থেকেই হযরত মীকাঈলের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।"

ইব্নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, তোমাদের দুনিয়ার এ আগুনের তাপ দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। পরন্তু এটাকে যদি আরও দু'বার পানি দিয়ে ধৌত করা না হতো, তবে সেটা তোমাদের ব্যবহারযোগ্য হতো না। তদুপরি এ আগুন আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে,

যেন পুনরায় এর মধ্যে আর উত্তাপ না আসে।"

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

"যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে, তৎক্ষণাৎ আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিবো, যেন তারা আযাবই ভোগতে থাকে।" (নিসা ঃ ৫৬) অতঃপর তিনি হযরত কা'ব (রাযিঃ)-কে বললেনঃ আপনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। যদি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে আমি তা সমর্থন করবো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করবো। হযরত কা'ব (রাযিঃ) ব্যাখ্যা করলেন যে, আদম-সন্তানের চর্ম প্রতিদিন ছয় হাজার বার জ্বালানো হবে এবং প্রতিবারই নতুন চর্ম সৃষ্টি করে নেওয়া হবে। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ আপনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন ; আমি সমর্থন করি।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ "দোযখের আগুন তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার খেয়ে ভস্মীভূত করবে ; প্রতিবার বলা হবে— পূর্বানুরূপ হয়ে যাও। বার বার এমনি হবে এবং এভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী-স্বচ্ছন্দ পাপাচারী দোযখী একজন মুসলমানকে এনে জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, হে আদমের সন্তান! জীবনে কখনও সুখ-সাচ্ছন্দ্য দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, কখনও দেখি নাই। অতঃপর দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্টপ্রাপ্ত একজন বেহেশতীকে এনে তাকেও জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনও কোন কষ্ট দেখেছো? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, কখনও দেখি নাই।

ইব্নে মাজাহ্ (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন ঃ দোযখীদের মধ্যে ক্রন্দনরোল সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে চক্ষুযুগল হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। এতে তাদের চেহারার ভিতর গর্তের মত হয়ে যাবে, যাতে নৌকা চালাতে চাইলে তা-ও সম্ভব হবে।

হযরত আবূ ইয়া'লা (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা কাঁদ, কাঁদতে না পারো তো কাঁদার ভাব-আকৃতি ধারণ কর। কেননা, দোযখীরা আগুনের ভিতর কাঁদতে থাকবে ; অশ্রুজল তাদের গণ্ডদেশে প্রবাহিত হবে যেমন নদীর পানি প্রবাহিত হয়। অবশেষে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে যাবে অতঃপর তারা রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করবে এবং তাদের চোখে (বড় বড়) খাদ পড়ে যাবে।

অধ্যায় ঃ ১১০

মীযান-পাল্লা ও পুলসিরাত

আবূ দাউদ শরীফে হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আয়েশা! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমার দোযখের কথা মনে পড়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন আপনি আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা কি স্মরণ করবেন? হুযূর বললেন ঃ সেদিন তিন জায়গায় তো কারুরই কারো কথা স্মরণ থাকবে না ঃ ১. যখন মীযান-পাল্লা স্থাপন করতঃ আমলের পরিমাপ করা হবে, মানুষ ভীতি-বিহ্বল থাকবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হবে নাকি বদীর পাল্লা। ২. আমলনামা বিতরণের সময়, তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। ৩. পুলসিরাত পার হওয়ার সময়, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত ; যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে না পারবে যে, পার হতে পারবে কিনা জাহান্নামে কেটে পড়ে যাবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি— ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য কি আপনি কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন? তিনি বললেন ঃ"ইনশাআল্লাহ্ করবো।" আমি আরজ করলাম ঃ সেদিন আপনাকে আমি কোথায় তালাশ করবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাকে পুলসিরাতের নিকট তালাশ করো। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনাকে পুলসিরাতের নিকট না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে মীযান-পাল্লার নিকট যেয়ো। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যদি মীযান-পাল্লার নিকটেও না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে আমাকে হাউজে-কাউসারের নিকট তালাশ করো। আমি এই তিন জায়গার যেকোন একটিতে অবশ্যই থাকবো।

হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, কিয়ামতের দিন মীযান-পাল্লা রাখা হবে। যদি সমগ্র আসমান-যমীনও এতে রাখা হয়, তবে তা রাখা সম্ভব। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এতে কার ওজন করা হবে? আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমি যার ইচ্ছা তার ওজন করবো। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ্! আপনি অনন্ত পবিত্র আপনার হক আদায় করে আমরা কিছুই ইবাদত করতে পারি নাই।"

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ দোযখের পৃষ্ঠ বরাবর পুলসিরাতকে স্থাপন করা হবে। তলোয়ারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও ধারালো হবে। পা পিছলিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হবে। পরন্তু অগ্রভাগ বাঁকানো আঁকড়া তথা লোহার শলাকা হবে, যা দিয়ে সে ছোঁ মেরে আটকিয়ে নিবে। অনেকেই তাতে পড়ে যাবে। আবার অনেকে ভিতরে পড়ে যাওয়ার আতংক সহকারে বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে, অনুরূপ অনেকে ঝঞ্চাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকে দৌড়িয়ে, আবার অনেকে হাটার গতিতে পার হয়ে যাবে। অবশেষে একজন আসবে, আগুন যাকে স্পর্শ করেছে এবং দোযখের শাস্তি কিছুটা সে আস্বাদন করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর তাকে বলবেন ঃ তুমি আমার কাছে চাও ; আবদার কর। সে বলবে, পরওয়ারদিগার! আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি সারা জাহানের রব্ব! আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি চাও ; আব্দার কর (আমি দিবো)। অতঃপর সে বহু আশা-আকাংখা ও আব্দার পেশ করবে। সব যখন তার শেষ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি যা কিছু চেয়েছ, সে সঙ্গে আরও সেই পরিমাণ তোমাকে দেওয়া হলো।

মুসলিম শরীফে হযরত উম্মে মুবাশশির আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত হাফসা (রাযিঃ)-কে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সাহাবীগণের যারা বৃক্ষের নীচে 'বাইয়াতে রিদওয়ানে' ছিলেন, তাদের কেউ ইনশাআল্লাহ্ দোযখে

যাবেন না। হযরত হাফসা বললেন ঃ তবে কুরআনের এ আয়াত?

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

"আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তা অতিক্রম করবেনা।" (মারয়াম ঃ ৭১)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পরবর্তী আয়াতেই ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

"অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহ্কে ভয় করতো এবং জালেম লোকদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো। (মারইয়াম ঃ ৭২)

'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে রয়েছে যে, 'দোযখ অতিক্রম করা'র বিষয়টিতে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ মুমিনদের জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ তা সকলেরই অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্কে ভয় করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নাজাত করে দিবেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের সকলকেই তাতে যেতে হবে" ; এ কথা বলার সময় তিনি আপন কর্ণদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, এ কথা যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বকর্ণে না শুনে থাকি, তবে যেন আমি বধির হয়ে যাই। তিনি বলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত 'ওরূদ' অর্থ প্রবেশ করা ; সুতরাং নেক বান্দা কিংবা না-ফরমান বান্দা সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তবে মুমিনদের জন্যে তা আরামদায়ক ও সুশীতল হয়ে যাবে, যেমন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর জন্য হয়েছিল। এমনকি তাদের এই আরামপ্রদ শীতলতার কারণে জাহান্নাম এই বলে আওয়াজ করবে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহ্কে ভয় করতো, আর সীমালংঘনকারীদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো।" (মারইয়াম ঃ ৭২)

হাকেম (রহঃ) বলেন ঃ লোকেরা (সুশীতল ও আরামদায়ক অর্থে) দোযখে প্রবেশের পর নিজ নিজ আমলের অনুপাতে অনেকেই বিদ্যুতের গতিতে, অনেকেই ঝঞ্ঝাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকেই সওয়ারীর গতিতে, অনেকেই দৌড়ের গতিতে, অনেকেই হাটার গতিতে বের হয়ে আসবে।

অধ্যায় ঃ ১১১

রাসূলুল্লাহ্র ওফাত

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত নিকটবর্তী হয়, তখন আমরা উম্মুল-মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ঘরে উপস্থিত হলাম। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টি করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ; মোবারকবাদ! আল্লাহ্ তোমাদের হায়াত দরায করুন, তোমাদের আশ্রয় দান করুন, সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি— সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় কর ; তাকওয়া এখতিয়ার কর। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত ; তোমরা আল্লাহ্র মোকাবিলায় তাঁরই সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠে এবং তার বান্দাদের উপর কখনও দম্ভ-অহংকার করো না। আল্লাহ্র সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের সুনির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী— এ প্রত্যাবর্তন সিদরাতুল-মুনতাহা, জান্নাতুল-মা'ওয়া ও ভরপুর বেহেশতী পেয়ালার দিকে। তোমরা সকলেই আমার সালাম গ্রহণ কর। আরও সালাম তাদের প্রতি, যারা আমার পর দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ করবে।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিবরাঈল! আমার পর উম্মতের নেগাহবান (রক্ষণাবেক্ষণকারী) কে হবে? এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈলের নিকট ওহী করলেন ঃ আমার হাবীবকে সুসংবাদ দাও যে, তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আমি তাঁকে লজ্জিত করবো না। তাঁকে আরও সুসংবাদ দাও যে, পুনরুত্থানের সময় তিনি সর্বপ্রথম যমীন থেকে বের হবেন ; হাশরের দিন তিনি সমবেত সকলের সর্দার হবেন এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্যান্য উম্মতের

জন্য জান্নাত হারাম থাকবে। নবীজী বললেন ঃ আমি শান্ত ও নিশ্চিন্ত হলাম।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম করলেন সাত কুঁয়া থেকে সাত মোশক পানি সংগ্রহ করে তা দিয়ে তাঁকে গোসল করাতে। আমরা সে অনুযায়ী তাঁকে গোসল করানোর পর তিনি অনেকটা আরাম অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হলেন। এমনকি নামাযে ইমামতি করলেন, উহুদ জিহাদের শহীদানের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ওসীয়ত করলেন ঃ হে মুহাজেরীন! তোমরা বৃদ্ধি পাবে, আর আনসারগণ যে অবস্থার উপর আছে, তার উপর বৃদ্ধি পাবে না। আনসারগণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আমি তাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। সুতরাং তোমরা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সম্মান কর, তাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তা উপেক্ষা কর।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত ধন-দৌলত ও সুখ-শান্তি দান করতে চাইলেন। কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে আল্লাহ্কেই গ্রহণ করলো।" এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন ; তিনি বুঝে গেলেন যে, নবীজী নিজকেই উদ্দেশ্য করেছেন। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর ব্যাকুলতা দেখে নবীজী তাঁকে শান্ত হতে বললেন, আরও বললেন যে, এই মসজিদের দিকে একমাত্র আবূ বকর ছাড়া অন্য কারও দরজা যেন খোলা না রাখা হয়। কেননা, প্রেম ও ভক্তির দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই আবূ বকরকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে, (পালাক্রমে নির্দিষ্ট) আমার দিনে এবং আমার কোলে ইনতেকাল করেন। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আমার লু'আব ও তাঁর লু'আব (মুখের লালা) একত্র করেছেন—আমার ভাই আবদুর রহমান এক খণ্ড মেসওয়াক হাতে আমার গৃহে উপস্থিত হোন। হযরত নবীজী এক দৃষ্টিতে মেসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেসওয়াক করতে চাইছেন বুঝতে পেরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আপনাকে দিবো? তিনি মস্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তাঁকে মেসওয়াকটি দিলাম।

তিনি মুখে প্রবেশ করিয়ে মেসওয়াকটিকে শক্ত অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আমি নরম করে দিবো? তিনি মস্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তা নরম করে দিলাম। নবীজীর সম্মুখে পানির একটি মোশক রাখা ছিল। এর ভিতর তিনি হাত দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, বাস্তবিক মৃত্যুর যন্ত্রণা বড় কঠিন। অতঃপর তিনি উপরের দিকে হাত উঠিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ

الرَّفِيقُ الْأَعْلَى

"সেই প্রিয়তম বন্ধুকেই চাই।"

তখন আমার বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, নবীজী এখন আর আমাদের মাঝে থাকতে রাজী নন।

হযরত সাঈদ ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) আপন পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, আনসারগণ যখন দেখলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে এসেছে, তখন মসজিদের চতুর্পার্শ্বে তারা ব্যাকুল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। হযরত ফযল ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) নবীজীর নিকট হাজির হয়ে লোকদের এহেন অবস্থা জানালেন। অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ)-ও নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ জানালেন। পরিস্থিতি জেনে নবীজী বাইরের দিকে আপন হস্ত মোবারক সম্প্রসারণ করে বললেন, তোমরা আমার হাতখানি ধর। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর হাতখানি ধরে রাখলেন। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমরা কি বলছো?" তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আপনার ওফাত হয়ে যায় আর স্ত্রীলোকেরা আপনার নিকট তাদের পুরুষদের জমা হওয়ার জন্য চিৎকার করতে লাগে। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহস করে হযরত আলী ও হযরত ফযল (রাযিঃ)-এর কাঁধে ভর করে বের হলেন। হযরত আব্বাস (রাযিঃ) নবীজীর আগে আগে ছিলেন। নবীজীর মাথায় তখন পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলে অগ্রসর হয়ে মিম্বরের নীচের সিড়িটির উপর বসলেন। লোকজন সকলেই বসলো। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন ঃ "ওহে লোকসকল! আমি

জানতে পেরেছি, আমার মৃত্যুর ভয়ে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত। এর অর্থ হলো—প্রকারান্তরে তোমরা এ মৃত্যুকে অস্বীকার করছো। অথচ তোমাদের নবীর মৃত্যু কোন বিস্ময়কর বা অভূতপূর্ব বিষয় নয়। আমি কি তোমাদেরকে কোন মৃত্যুসংবাদ শুনাই নাই, অথবা তোমরাই কি এরূপ সংবাদ শুন নাই? আমার পূর্বের কোন নবী কি চিরকাল যিন্দা রয়েছেন? যার ফলে আমিও যিন্দা থেকে যাবো? শুনে নাও— আমি আমার পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্য চাই, তোমরাও তার সাথে গিয়ে মিলবে। আমি তোমাদেরকে আওয়ালীন তথা প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য ওসীয়ত করছি আর মুহাজিরগণও পরস্পর যেন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এ ওসীয়ত করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"যমানার কসম, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে, এবং একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে, এবং একে অন্যকে (আমলের) পাবন্দ থাকার উপদেশ দিতে থাকে (তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে)।" (আছর ঃ ১-৩) জগতের প্রতিটি কাজ ও বিষয় আল্লাহ্র হুকুমেই সংঘটিত হয়। কোন বিষয়ে বিলম্ব হলে জলদি করতে নাই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কারো তাড়াহুড়ার কারণে কোন বিষয় সময়ের পূর্বেই সংঘটিত করেন না। পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে (সীমা লংঘন) করবে, সে পরাভূত হবে। আল্লাহ্কে যে ধোকা দিতে চেষ্টা করবে, সে নিজেই ধোকার মধ্যে পড়বে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

"সুতরাং যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক, তবে কি তোমাদের এই

সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর আত্মীয়তা কর্তন করে ফেলবে?" (মুহাম্মদ ঃ ২২)

আমি তোমাদেরকে আনসারগণের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুসম্পর্কের ওসীয়ত করছি। তারাই তোমাদের পূর্বে দারুল-ইসলামে (মদীনায়) এবং দ্বীন ও ঈমানের উপর অটল রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি তোমাদের এহসান ও সদ্ব্যবহার হওয়া চাই। তারা কি নিজেদের ফলমূলে তোমাদের অংশ রাখে নাই? তারা কি নিজেদের গৃহে তোমাদের আবাস দেয় নাই? তারা কি নিজেদের জীবনের উপর তোমাদের জীবনকে প্রাধান্য দেয় নাই? অথচ তাদের নিজেদেরও অভাব-অনটন ছিল? খবরদার! দুই ব্যক্তির উপরও যদি তোমাদের কেউ আমীর বা শাসক নিযুক্ত হয়, তবে তাঁদের নেক লোকদের উযর যেন কবূল করে এবং অন্যায়কারীকে মার্জনা করে। খবরদার! তাঁদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিও না। খবরদার! আমি তোমাদের জন্য সত্য ও সঠিক পথের দিশারী। অচিরেই আমার সাথে তোমাদের দেখা হবে। হাউজে-কাউসারে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইল। আমার হাউজে-কাউসার শ্যাম দেশের বুসরা থেকে ইয়ামানের সানআ পর্যন্ত দূরত্ব অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। হাউজে-কাউসারের পানি দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র, মাখনের চেয়েও বেশী মোলায়েম, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট ; তা থেকে একবার যে পান করবে সে পিপাসার্ত হবে না কোনদিন। হাউজের কাঁকরগুলো হচ্ছে মুক্তা ও মোতির দানার, আর নীচের যমীন হচ্ছে মুশকের। হাশরের ময়দানে যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত হবে, সে আর সব রকম কল্যাণ ও সাফল্য থেকেও বঞ্চিত হবে। খবরদার! যে ব্যক্তি সেদিন আমার সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন তার জিহ্বা ও হাতকে সংযত করে।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরাইশদেরকে ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ 'দ্বীনের ব্যাপারে আমি কুরাইশদেরকে ওসীয়ত করি। লোকেরা কুরাইশদের তাবে' বা অনুসারী— সৎ লোকেরা তাদের সৎ লোকের আর অসৎ লোকেরা তাদের অসৎ লোকের। সুতরাং কুরাইশদের উচিত হলো, মানুষের কল্যাণ ও হিতকামনা করা। হে লোকসকল! গুনাহ্ মানুষের সুখ-শান্তি ও নেআমতকে নষ্ট করে দেয় এবং সৌভাগ্যকে বদলিয়ে দেয়। সাধারণ লোকেরা যদি সৎ হয়, তবে

তাদের শাসকও সৎ হবে, আর যদি তারা অসৎ হয়, তবে তাদের শাসকও অসৎ হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

"আর এভাবেই আমি সংযুক্ত করে দেই জালেমদের কতিপয়কে তাদেরই কতিপয়ের সাথে তাদেরই কার্যকলাপের দরুন।" (আনআম ঃ ১২৯)

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-কে বলেছেন ঃ হে আবূ বকর! তুমি কিছু বল। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ওফাত কি নিকটবর্তী? তিনি বললেন ঃ হাঁ ;নিকটবর্তী আরও নিকটবর্তী। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত নেআমত-রাজি আপনার জন্য মোবারক হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আরও যদি এমন হতো যে, আমরা আমাদের পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতাম। হুযূর বললেন ঃ সিদরাতুল-মুনতাহার দিকে, তারপর জান্নাতুল-মা'ওয়া, উচ্চতর জান্নাতুল-ফেরদাউস,ভরপুর বেহেশতী পেয়ালা, প্রিয়তম বন্ধু ও পবিত্র নাজ-নেয়ামত ও প্রচুর আরাম-আয়েশের দিকে। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে গোসল কে দিবে? বললেন ঃ আমার আহলে বাইত যারা। আরজ করলেন ঃ আপনাকে কিরূপ বস্ত্রে কাফন দেওয়া হবে? বললেন ঃ আমার পরিহিত এই পোষাকে, ইয়ামনী জোড়ায় এবং মিসরীয় সাদা কাপড়ে। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জানাযার নামায কে পড়াবে? এ কথা বলে আমরা কেঁদে ফেললাম, নবীজীও কাঁদলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তার নবীর পক্ষ থেকে তোমাদের উত্তম বিনিময় দন করুন ; তোমরা আমার গোসল ও কাফনকার্য সমাধা করার পর এ গৃহেই আমার কবরের পার্শ্বে জানাযার খাটলি রেখে দিও, অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য তোমরা বাইরে চলে যেও। সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন আমার প্রতি দয়া ও রহমতের সালাত ও সালাম পড়বেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

"তিনি ও তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" (আহযাব ঃ ৪৩)

অতঃপর আমার জানাযার নামাযের জন্য ফেরেশতাগণ অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন। সর্বপ্রথম তাঁদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তরপর হযরত মীকাঈল (আঃ) তারপর হযরত ইসরাফীল (আঃ) তারপর হযরত আযরাঈল (আঃ) প্রচুর ফেরেশতাদল সহকারে দরূদ ও নামায আদায় করবেন। তারপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতাগণ। অতঃপর তোমরা নামায আদায় করবে—পালাক্রমে দলবদ্ধ হয়ে তোমরা আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পড়বে, এ সময় কান্নাকাটি ও চিৎকার করে আমাকে কষ্ট দিও না। সর্বপ্রথম তোমাদের ইমামও আমার পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়গণ নামায পড়বে, তারপর মহিলাগণ এবং সর্বশেষে বালকেরা নামায পড়বে। আরজ করলেন ঃ আপনাকে কবরে কে স্থাপন করবে? তিনি বললেন ঃ আমার আহলে বাইতের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়গণ। তাদের সঙ্গে থাকবেন বিপুলসংখ্যক ফেরেশতা, যাদেরকে তোমরা দেখবে না ; অথচ তারা তোমাদেরকে দেখবেন। এখন উঠ, আমার পক্ষ থেকে উম্মতের পরবর্তীদের নিকট দ্বীন পৌঁছিয়ে দাও।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের দিনটিতে শুরুভাগে যথেষ্ট আরাম বোধ করছিলেন। লোকেরা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কাজ-কর্মে মগ্ন হয়ে যায়। নবীজী তাঁর বিবিগণের সেবা-শুশ্রূষায় ছিলেন। আমরা এরূপ আনন্দিত ; যা ইতিপূর্বে আর হই নাই। এরই মধ্যে অকস্মাৎ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই স্ত্রীলোকেরাই অপেক্ষমান ফেরেশতার গৃহে প্রবেশে বাধা হয়ে রয়েছে ; এ ফেরেশতা আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। এ কথা শুনে সকলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল ; কেবল আমিই রয়ে গেলাম। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক ছিল আমার কোলের উপর। ফেরেশতা গৃহে প্রবেশ করার পর নবীজী উঠে বসলেন, আমি গৃহের এক কোণে চলে গেলাম। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবীজী ফেরেশতার সাথে একান্তে গোপন আলাপে মগ্ন রইলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং পুনরায় আপন শির মোবারক আমার কোলে

রাখলেন। অতঃপর অন্যান্য বিবিগণকে গৃহে প্রবেশের জন্য বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি কি হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন ? নবীজী বললেন ঃ না, মালাকুল-মউত হযরত আজরাঈল (আঃ) ; তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন গৃহে প্রবেশ না করি, এবং আপনি অনুমতি না দিলে যেন ফিরে যাই। আপনার অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ করেছি। আল্লাহ্ আমাকে আরও হুকুম করেছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন আপনার রূহ কবজ না করি ; এখন আপনার কি হুকুম। নবীজী বললেন ঃ বিরত হোন, এই সময়টা হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর উপস্থিতির সময়।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ এহেন অবস্থায় আমরা হতবাক ছিলাম, কি করবো কি না করবো কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। কারও মুখে কোন কথা বেরুচ্ছিল না ; দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তায় সকলেই ভারাক্রান্ত, আমাদের উপর বিরাট এক মুসীবত, ফলে সকলেই নির্বাক অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনয়ন করলেন এবং সালাম দিলেন। আমি তার আগমন ও কথা অনুভব করেছিলাম। উপস্থিত পরিবারবর্গ ও নিকট-আত্মীয়গণ বের হয়ে যাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনার অবস্থা এখন কেমন? যদিও তিনি সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত, কিন্তু আপনার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য এবং সমস্ত মাখলূকাতের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন। সেইসঙ্গে আপনার উম্মতের মধ্যে এর প্রচলন ঘটানোও উদ্দেশ্য। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি অসুস্থতায় কাতর হয়ে গেছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ আপনি সুসংবাদ নিন-- আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সেই স্থানে শীঘ্রই পৌছাবেন, যে স্থানটিকে শুধু আপনার জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছেন। নবীজী বললেন ঃ হে জিবরাঈল! মালাকুল-মউত অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন ; তিনি আমাকে আমার বিষয় জানিয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব ; হযরত জিবরাঈল কি এ বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করেন নাই? আল্লাহ্‌র কসম, আজ পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারও নিকট অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও তা করবেন না। কিন্তু আপনার পরওয়ারদিগার আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান। তিনি আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব। সুতরাং হযরত মালাকুল-মউত উপস্থিত হলে তাঁকে ফিরাবেন না। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে ফাতেমা! আমার নিকটবর্তী হও। হযরত ফাতেমা অতি সন্নিকটবর্তী হলে নবীজী কানে কানে কি যেন এক গোপন কথা বললেন। নবী-তনয়া এরপর কাঁদতে লাগলেন ; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। অতঃপর নবীজী তাঁকে পুনরায় নিকটবর্তী হতে বললেন। নবীজী তাঁর কানে কানে আর একটি গোপন কথা বললেন। এবার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) হেসে উঠলেন ; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আমরা এটা একটা আশ্চর্যকর বিষয় দেখলাম। পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এর রহস্য খুলে বলেছেন যে, প্রথমবার নবীজী তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন বলে আমি কেঁদেছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি জানান যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে বেহেশতে মিলিত হবো। এইজন্যই আমি হেসেছিলাম। অতঃপর নবীজী হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযিঃ)-এর দুই পুত্রকে নিকটে এনে তাদেরকে চুম্বন করলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ অতঃপর হযরত মালাকুল-মউত তশরীফ আনয়ন করেন এবং সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবীজী তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মালাকুল-মউত নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এবার আপনার কি মর্জী, বলুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَلْحِقْنِىْ بِرَبِّىْ اَلْاٰنَ

"পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্যে এখন আমাকে পৌছিয়ে দিন।"

তিনি বললেন ঃ হাঁ, আজকের দিনেই তা হবে। আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব। একমাত্র আপনি ব্যতীত বারবার আমি অন্য কারও

নিকট যাই নাই, এবং আপনি ছাড়া আর কারও নিকট আমি অনুমতির অপেক্ষাও করি নাই। তবে এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এই বলে হযরত মালাকুল মউত বের হয়ে যান। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনয়ন করেন। নবীজীকে সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়াতে আমার এই সর্বশেষ অবতরণ, ওহী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ; সবকিছু গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে, দুনিয়ার জীবনও তার শেষ প্রান্তে। আপনার কাছে উপস্থিত হওয়াটাই দুনিয়াতে আমার কাজ ছিল ; অন্য কোন প্রয়োজন দুনিয়ার সাথে আমার আর নাই ; এখন আমি আমার স্থানেই অবস্থান করবো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন—তখন এমন অবস্থা দেখা গেছে যে, কারও ক্ষমতা নাই যে, সামান্যতম টু শব্দটিও করবে, আর না সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কাউকে সংবাদ প্রেরণের কোন অবকাশ ছিল। সুতরাং আমরা যা শুনছিলাম ও অনুভব করছিলাম, তা শুনে ও অনুভব করেই রয়ে গেলাম ; আর আমাদের হৃদয়ে ছিল তখন ভয় আর দুঃখ।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক আমার কোলে রাখার জন্য আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। এক পর্যায়ে তিনি বেঁহুশ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর চেহারা এতো বেশী ঘর্মাক্ত হয়ে গেল যে, এরূপ ঘর্মাক্ত হতে আমি আর কাউকে দেখি নাই। আমি তাঁর চেহারা হতে ঘাম মুছতে লাগলাম। তখন এতে আমি এমন খোশবূ অনুভব করলাম যে, এরচেয়ে উত্তম খোশবূ আমি কোনদিন আর কোথাও পায় নাই। নবীজীর চৈতন্য ফিরে আসলে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন—আপনার চেহারা মোবারক প্রচুর ঘামাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! ঈমানদারের জান ঘাম দিয়েই বের হয়, আর কাফেরের জান চোয়াল দিয়েই বের হয় ; যেমন গাধার জান বের হয়ে থাকে। এ কথা শুনে আমরা কেঁপে উঠলাম। অতঃপর অন্যান্যদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর প্রেরণ করলাম। সর্বপ্রথম আমার ভাই উপস্থিত হলেন ; তাকে আমার পিতা আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি উপস্থিত হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়। এমনিভাবে

অন্যান্যরাও হুযূরের ওফাতের পরই উপস্থিত হলেন। এভাবে মৃত্যুর পূর্বে কারও উপস্থিত হতে না পারার তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার মর্জীতে এরূপ হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আঃ) বন্ধুরূপে ছিলেন। যখন নবীজীর বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তখন বলতেন ঃ

الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

"পরম প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্য চাই।"

যখন তিনি কিছুটা কথা বলার মত হলেন, তখন বললেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ اِنَّكُمْ لَا تَزَالُوْنَ مُتَمَاسِكِيْنَ مَا صَلَّيْتُمْ جَمِيْعًا

"নামায, নামায ; তোমরা সকলে যতদিন নামাযের উপর দৃঢ় থাকবে, ততদিন তোমরা দ্বীন ও ঈমানের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

এই নামাযের ওসীয়ত তিনি ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত এভাবে বারবার করতে থাকেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ

"নামায, নামায।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ "রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় সোমবার দিন চাশত এবং দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝি সময়ে।" হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাযিঃ) বলেন ঃ "সোমবার দিনে আমি (হুযূরের ইনতেকালে) যে শোক ও দুঃখের সম্মুখীন হয়েছি, এ দিনটিতে উম্মতের বড় বড় দুঃখ রয়েছে।" অথবা হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) অনুরূপ উক্তি করেছিলেন, যেদিন হযরত আলী (রাযিঃ)-কে তীরবিদ্ধ করে নিহত করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিন লোকদের খুব বেশী ভীড় হয়ে যায় এবং কান্নাকাটির আওয়াজ আসতে লাগে, তখন ফেরেশতাগণ আমার কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দেখা দিল।

কেউ বললেন, হুযূরের ওফাত হয় নাই। দুঃখ ও বেদনায় কারও কারও যবান বন্ধ হয়ে গেল ; অনেক দেরীতে কথা বলতে পারলেন। বিভিন্ন ধরণের অবস্থা তাদের উপর ছেয়ে আসলো। হযরত উমর (রাযিঃ) হুযূরের মৃত্যুকে অস্বীকার করছিলেন। (দুঃখ ও বেদনায় কাতর হয়ে এমন হয়েছিল)। হযরত আলী (রাযিঃ) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রাযিঃ) কথা বলতে অপারগ হয়ে গেলেন। কেবল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-এর অবস্থা আপন নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু লোকেরা হযরত আবূ বকরের কথায় কর্ণপাত করছিল না। অবশেষে হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তশরীফ এনে বললেন ঃ

والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ولقد قال وهو بين اظهركم انك ميت وانهم ميتون ۝ ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ۝

"একমাত্র মা'বূদ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কসম, নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি নিজেই যখন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন ঃ "হে নবী! আপনাকেও মরতে হবে, এবং তারাও মরবেই। তারপর কিয়ামত-দিবসে তোমরা স্বীয় পরওয়ারদিগার-সমীপে মোকদ্দমা পেশ করবে।" (যুমার ঃ ৩১)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবীজীর ওফাতের সময় বনী হারস ইব্‌নে খাযরাজের নিকট ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হলেন, অপলক নেত্রে নবীজীর মোবারক চেহারাখানির প্রতি তাকিয়ে রইলেন এবং কপালে চুম্বন করে বললেন ঃ

بابي انت وامي يا رسول الله ما كان الله ليذيقك الموت مرتين

فقد والله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন ; আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দু' বার মৃত্যু আস্বাদন করাবেন না। অবশ্যই অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে।"

অতঃপর তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে সমবেত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فانه حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الاية

"ভাইসব! তোমরা যারা রাসূলুল্লাহ্‌র ইবাদত করেছো, তাদের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে জানবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করেছো, তারা জেনে রাখ-- আল্লাহ্ জীবিত এবং কখনও তাঁর মৃত্যু হবে না। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হোন, তবে কি তোমরা পিছনের (পূর্বমতের) দিকে ফিরে যাবে।" (আলি-ইমরান ঃ ১৪৪)

লোকদের অবস্থা এই হলো যে, তারা আজকেই যেন প্রথম এ আয়াত শ্রবণ করলেন।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সংবাদ পাওয়া মাত্রই এসে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি দরূদ শরীফ পড়ছিলেন আর হেঁচকি নিয়ে কাঁদছিলেন। তার চোখ বেয়ে ভরা কলসী থেকে ঢালা পানির ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তায় পর্বতসম

মজবূত ছিলেন। নবীজীর মোবারক চেহারার উপর থেকে আবরণখানি তুলে তাঁর কপাল চুম্বন করলেন, চেহারায় হাত বুলালেন আর কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আপনার উপর আমার মা-বাপ, পরিবার-পরিজন ও আমার জান কুরবান, আপনি জীবনে-মরণে সর্বাবস্থায় আনন্দময় রয়েছেন। আপনার ওফাতের পর ওহীর ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা ইতিপূর্বে আর কোন নবীর বেলায় হয় নাই। আপনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী, কাঁদাকাটির বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন আপনি। আপনি নিজ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য গুণেই সুখী, শান্ত ও সংরক্ষিত রয়েছেন ; এমনকি আপনার পূর্বাপর অবস্থা আমাদের কাছে একই রয়েছে। যদি মৃত্যু আপনার কাংক্ষিত ও পছন্দনীয় না হতো, তবে আপনার বিচ্ছেদে আমরা প্রাণ দিয়ে দিতাম, যদি আপনি আমাদেরকে কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তবে আমরা আপনার জন্য অশ্রুর ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিতাম, আর যে বিষয়টি আমাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে অর্থাৎ বিচ্ছেদ-বেদনা ; তা অবশ্যই থেকে যাবে ; কোনদিন ভুলা যাবে না। আয় আল্লাহ্! আমাদের এ কথাগুলো আপনার হাবীবের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের স্মরণ করুন, আপনি নিজেও আমাদেরকে স্মরণ করুন। আপনি যদি আমাদেরকে ধৈর্য ও স্থিরতার শিক্ষা না দিতেন, তাহলে এই ব্যথা ও বেদনায় আমাদের কেউ দাঁড়াতে পারতো না। আয় আল্লাহ্! আপনার নবীর কাছে আমাদের এ আর্জীগুলো পৌঁছিয়ে দিন এবং আমাদেরকে নেক আমলের তওফীক দিন।

هٰذَا اٰخِرُ مَا اَقْدَرَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَجَذَبَ قُلُوْبَنَا اِلَيْهِ لِيَكُوْنَ لَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَنَرْجُوْ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يُبَدِّلَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَاَنْ يُلْحِقَنَا بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِيْمَانِ اِنَّهُ اَكْرَمُ مَسْؤُوْلٍ وَاَعَزُّ مَأْمُوْلٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

[মুকাশাফাতুল কুলূব পূর্ণ সমাপ্ত]